স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক

এম বাহাউদ্দিন

email: probashi_writer@yahoo.ca

শেষ পর্যন্ত কেনেডী এয়ারপোর্টে এসে অবতরণ করল আনিসুর রহমান ওরফে আনিস। ইমিগ্র্যাশান লাইনে দাঁড়িয়ে তার বুক দুরু দুরু করছে! এই বুঝি তার ঘুম ভেঙ্গে যাবে! গত আটটা বছর প্রায় প্রতি রাতেই আমেরিকায় এসেছে। নানা ভাবে নানা অবস্থায় নিজেকে দেখেছে। এমনি ইমিগ্রেশানও হয়েছে বহুবার। আর ঘুম ভেঙ্গে দেখেছে সেই পুরাতন বিছানা, সেই ঘর আর বাংলার মাটি।

ইমিগ্র্যাশান শেষে কাষ্টমস-এর জেরা এবং মালামাল তছনছের ঝামেলা কাটিয়ে বাইরে এসে হাফ ছাড়ল আনিস। শরীরটাকে একবার ঝাড়া দিয়ে দেখল। নাহ, সে ঘুমিয়ে নেই। এবার সত্যিই এসে পৌঁছেছে! তবুও তার বিশ্বাস হচ্ছেনা। কতবার স্বপ্নের ঘোরেও চাচাকে সে বলেছে, "এখনই আমার ঘুম ভেঙ্গে যাবে আর আমি দেখব আমার সেই পুরাতন বিছানায় শুয়ে আছি।" চাচা আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, না, এবার তুমি সত্যি সত্যি এসে গেছ। ঘুম ভাঙ্গার ভয় নেই। তারপরও ঘুম ভেঙ্গেছে আর নিজকে আবিস্কার করেছে তার সেই চিরপুরাতন বিছানায়।

চারদিকটা তাকিয়ে দেখল। সবকিছু নতুন মনে হয়। বাইরে লাইন ধরে হলুদ ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁকা ফাঁকা ইমারত। সবকিছু দেখে মনে হয় বাস্তবেই সে এসে গেছে। কিন্তু চাচা কই! চাচা তো নিজের গাড়ী নিয়ে এয়ারপোর্টে থাকার কথা। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। না, চাচার চেহারার মত কোন মানুষ চোখে পড়ছেনা।

চাচাকে সে জীবনে একবারই দেখেছে। যখন দশম শ্রেণীতে পড়ে তখন চাচা একবার বাংলাদেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তার মায়ের কাছে শুনেছে চাচার কথা। শত সহস্র বার। উঠতে বসতে। যখন তখন। প্রতি দিন। যেন মায়ের আর একটা সন্তান। চাচা টাকা না পাঠালে তাদের কি অবস্থা হত কে জানে। এ কথা প্রায় প্রতিদিন শুনে আসছে। চাচা জাহাজে কাজ করতেন। পদোন্নতি পেয়ে সারেং হয়েছিলেন। জাহাজে করে দেশ বিদেশ ঘুরতেন, বন্দর থেকে বন্দরে, দেশ থেকে দেশান্তরে। নানা দেশের নানা মানুষের সাথে মিশে সঞ্চয় করেছেন অভিজ্ঞতা। তার সাথে নতুনত্বের স্বাদ। একদিন আমেরিকায় এসে আর ফিরে যাননি। আমেরিকান মহিলা বিয়ে করে একেবারে পাকাপোক্ত আমেরিকান হয়ে একবার মাত্র গিয়েছিলেন বাংলাদেশে। বেড়াতে।

চাচা বলেছিলেন, লেখাপড়া শেষ কর। অন্তত এম এ-টা পাশ কর। তারপর আমি তোমাকে নিয়ে যাব আমেরিকায়। সেই থেকে আনিসকে আমেরিকার রোগে পেয়েছে। মস্তিষ্কের সমস্ত কোষগুলো তখন থেকেই আমেরিকার স্বপ্নে কানায় কানায় পূর্ণ। কাজে কর্মে, শয়নে স্বপনে শুধুই আমেরিকা।

চাচার কথামত এম এ পাশ করেও আশায় বুক বেঁধে বসে ছিল। চাচা-চাচী মিলে চেষ্টা করছে। এই আর কয়েক মাস। হয়নি। ইমিগ্র্যাশান আইনের আওতায় কোন ব্যবস্থাই করা যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত চাচা-চাচী মিলে ষ্টুডেন্ট ভিসার ব্যবস্থা যখন করছিলেন তখনই এই ওপি ওয়ান পেয়ে গেল আনিস। ফরমটা অবশ্য চাচীই পাঠিয়েছিলেন।

স্বপ্ন দেখত নানা ভাবে, নানা অবস্থায় - আমেরিকা - লক্ষ কোটি টাকা - রাজকীয় জীবন আরও কতকি!

জেগেও স্বপ্ন দেখত আনিস। দেখত রহমান কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর ম্যানেজার, বিরাট মার্সিডিস গাড়ী, ড্রাইভার - সুন্দরী মহিলা সেক্রেটারী - আলিশান বাংলো। সে অফিসে ঢুকছে, সকলে দাঁড়িয়ে বলছে, "গুড মর্নিং"। এমনি কতকি! একদিন স্বপ্ন দেখেছিল সে এয়ারপোর্টে এসে চাচাকে দেখতে না পেয়ে অভিমান করে ফিরে যাচ্ছে - ঠিক তখনি তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আজও কি তাহলে স্বপ্ন! তবুও চাচার জন্য অপেক্ষা করে। পায়চারি করে। হঠাৎ চিঠির কথা মনে হল। চাচা চিঠিতে সবকিছু লিখে দিয়েছেন। কোন কারণে যদি এয়ারপোর্টে আসতে না পারে তাহলে কিভাবে বাসায় পৌঁছতে হবে। বাসার ঠিকানা দিয়ে যে কোন হলুদ গাড়ীকে বললে ঠিক পৌঁছে দেবে। আনিস কালবিলম্ব না করে একটা ট্যাক্সিকে ঠিকানা দিয়ে চড়ে বসল। ২৩৩ নষ্ট্রেন্ড এভিনিউ, ব্রুকলীন।

স্বপ্ন যখন সত্যি হয় তখন পৃথিবীটাকে মনে হয় একটা ফুলের তোড়া। নানা জাতের নানা সুবাসে তৈরী। সেই সুবাস দেহের প্রতিটি স্নায়ুতে ঝংকার তোলে। ছন্দের তালে নিঃশ্বাস বয়। তুচ্ছ বস্তুকে মনে হয় অসাধারণ। সুন্দর, স্বপ্নময়।

ট্যাক্সিতে বসে আনিসের মনের অফুটন্ত কুড়িগুলো হঠাৎই যেন পাখা মেলে দিল। এখন সে আকাশে উড়ছে। আনন্দের সাগরে ভাসছে। সত্যি সত্যি এসে গেছে! জীবন সুন্দর। যেদিকে তাকায় সেদিকেই সৌন্দর্যের সমারোহ। পথের দুপাশের বাড়ীঘর, সুউচ্চ অট্টালিকা, প্রত্যেকটি বাড়ীর সামনে ফুলের বাগান, কত চেনা অচেনা ফুল ফুটে আছে! সবকিছুই যেন আনিসকে স্বাগত জানাচ্ছে। তার এ আনন্দ-ভাবনায় হঠাৎ ছেদ পড়ল ড্রাইভারের প্রশ্নে।

আপনি কি বাংলাদেশি?

আনিস আশ্চর্য হয়ে গেল। ড্রাইভার বাংলায় জিজ্ঞেস করেছে। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, হ্যা, বাংলাদেশি। আপনি বুঝলেন কি করে?

বুঝা যায়, গায়ের চামড়া দেখেই বুঝতে পারি। মুখে বাংলার একটা আলাদা ছাপ আছে। যা দিয়ে আমি বুঝতে পারি। তা দেশের খবর কি?

কি খবর জানতে চান?

রাজনৈতিক অবস্থা - দেশের মানুষের অবস্থা। জিনিষ পত্রের দাম এখন কেমন? আগের চেয়ে কম না বেশি।

একটা কঠিন প্রশ্ন করলেন। জিনিষ পত্রের দাম পৃথিবীর কোন দেশেই কমেনা। যা একবার উপরে উঠে তা নীচে নেমে আসে না। আর আমাদের তো দাবী বেশি। বেতন বাড়ার দাবী। বেতন যদি বাড়ে এক টাকা জিনিষের দাম বাড়ে অনুপাতে পাঁচ টাকা। কাজেই জিনিষের দাম কমবে এ আশা করা যায় না।

এই যে আপনার ঠিকানা - বলে ট্যাক্সি থামল এক অট্টালিকার দরজায়।

একটা ধন্যবাদ দিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে ঠিকানাটা মিলিয়ে নিল। একদম মিলে গেছে। কোন ভুল হয়নি। ২৩৩ নষ্ট্রেন্ড এভিনিউ। ব্যাগটা

হাতে নিয়ে প্রধান ফটক পেরিয়ে ভেতর ঢুকল। ডানদিকের দেয়ালে কলিংবেলের পাশে লেখা আছে - বি, রহমান - সি ২২। খুশীতে আনিসের মন নেচে উঠল। চাচাকে তাক লাগিয়ে দেবে। আঙ্গুলটা আনন্দে নাচাতে নাচাতে বি রহমানের বোতাম টিপল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার টিপল। কোন সাড়া নেই। আর একবার, দুবার, তিন বার, বার বার টিপতেই থাকল। কোন সাড়া নেই। তাহলে? চাচা কি নেই? বাসা বদল করেছে? ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে না তো! আবার তার মনে সন্দেহ হল। এখনি বোধ হয় তার ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

শরীরটাকে আর একবার ঝাড়া দিয়ে দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। শরীরে চিমটি কেটে দেখল। না, ঘুমিয়ে নেই সে। অট্টালিকার নাম্বার মিলিয়ে দেখল। সব ঠিক আছে। উপর দিকে তাকিয়ে দেখে আকাশচুম্বি মহা অট্টালিকা। দেখতে ঢাকার কার্জন হলের মত। মনে মনে ভাবল চাচা হয়ত কাজে ব্যস্ত। ফিরবে অবশ্যই। তাই সে অপেক্ষা করতে লাগল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে আমেরিকাটাকে দেখে নিচ্ছে। রাস্তা দিয়ে অনেক লোকজন আসা যাওয়া করছে। কেউ কারও দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেনা। যেন কারও সময় নেই। দরজা দিয়ে এই ইমারত থেকে কেউ বাইরে যাচ্ছে, কেউ ভেতরে আসছে। কারও সাথে কেউ কথা বলছেনা। এত এত লোকের মাঝে আনিস আমেরিকান লোক খুঁজছে। আমেরিকান মানুষ তো সাদা হয়। একটাও সাদা মানুষ চোখে পড়লনা। সব আফ্রিকান। আনিস শুনেছে আমেরিকাতে আফ্রিকান কালো মানুষ অনেক আছে। এখানে কি সবই আফ্রিকান? এয়ারপোর্টে সে কোন কালো মানুষ দেখেছে কিনা মনে করতে পারছেনা। হয়ত বা খেয়াল করেনি। এখানে একটাও সাদা মানুষ নেই। ওদিকে বেলা প্রায় যায় যায়। অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায়ও দেখছেনা। এমন সময় বাঙালী চেহারার দু'জন লোক এসে এলিভেটররের সামনে দাঁড়াল। তাদের পরনে ময়লা কাপড়। সাদা রং আর ময়লা মিলে কাপড়ের আসল রং মুছে গেছে। হাতে পায়ে মুখেও রংএর দাগ লেগে আছে। আনিস প্রায় ছ'ফুট লম্বা, মেদহীন দেহ। পঁচিশ বছরের যুবক। আগন্তুকের একজন তার দিকে তাকিয়ে আছে। আনিস ভাবছে তাদের কিছু জিজ্ঞেস করবে কিনা। চোখাচোখি হতেই লোকটি জিজ্ঞেস করল -

আর ইউ ফ্রম বাংলাদেশ?

ইয়েস বলতেই আবার জিজ্ঞেস করল, আপনি সারেং ভাইর ভাতিজা?

জ্বি হ্যাঁ। আমি আনিস।

আমার নাম আলম। আসুন উপরে। আপনার থাকার জায়গা আমাদের সাথেই করা আছে।

চাচা কোথায়?

উনি তো এখনও কাজে। আরও ঘন্টা দুই লাগবে ফিরতে।

আনিস তাদের সাথে উপরে গেল। কামরায় ঢুকতেই বদ্ধ ঘরের একটা বিশ্রি গন্ধ এসে নাকে ধাক্কা দিল। ধাক্কাটা সামলে ঘরের দিকে তাকিয়ে থ হয়ে গেল। একি! বাইরে থেকে দেখতে কার্জন হলের মত, আর ভেতরে এই! একটা কামরা, তিনটা বিছানা পাতা। রংচটা দেয়ালে বিশ্বের মানচিত্র আঁকা। টিমটিমে একটা আলো জ্বলছে। ক্ষীণ আলোতে ঘরের চেহারাটা আরও জীর্ণ দেখায়। তিনটা বিছানা পাতার পর ঘরে দাঁড়াবার জায়গা নেই। একটা বিছানার উপর গাদা করা ময়লা কাপড়। কামরার একটা দিক একটু বাড়ানো। তাতে রান্না করার ব্যবস্থা। একপাশে ছোট্ট একটা টেবিল। তার উপর দুটো বাসন, একটা চায়ের

কাপ, দু পাশে দুটো হাতল বিহীন চেয়ার, এক কোণে কিছু চিঠিপত্র। চুলার পাশে দেয়ালে কিছু শিশিবোতল, মসলার কৌটা। তার নীচে কয়েকটা বাক্সপেটরা।

ঘরে ঢুকেই আলম বলল, করিম ভাই আমি বাথরুমে গেলাম। আনিসের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি কাপড় বদলে বিশ্রাম করুন। করিম রান্নাঘরের বেসিনে গিয়ে দাঁড়াল। আনিস এতক্ষনে খেয়াল করল করিমের হাতে একটা পলিথিনের ব্যাগ। ব্যাগ থেকে একটা বড় ধরনের মুরগি বের করে ছুরি দিয়ে কাটতে শুরু করল।

লোকটার বয়স পঞ্চাশের উপর হবে। খুব শক্ত সামর্থ দেহ। শরীরে কোন মেদ নেই। হাতের পেশী দেখলে মনে হয় শরীরচর্চাবিদ। মাথার চুল ছোট করে ছাটা। গায়ের রং শ্যামলা। মুরগীটাকে রান্নাঘরের বেসিনে রেখে কয়েকটা টানে দুমিনিটের মাঝে মুরগি কাটা হয়ে গেল। মনে হল এটা মুরগী নয়, নরম তুলতুলে কোন একটা পদার্থ। যন্ত্রচালিতের মত তিনি মুরগিটাকে ধুয়ে এক পাশে রাখলেন। তারপর কয়েকটা শিশি বোতল উপর থেকে নামিয়ে ঢালতে লাগলেন।

বাথরুম থেকে ফিরে এসেই আলম জিজ্ঞেস করল, ভাতিজা, রান্না শিখে এসেছ তো?

আনিস অপ্রস্তুত হয়ে গেল। এ্যা, রান্না শিখতে হবে! মুখে বলল, চাচা লিখেছিলেন ড্রাইভিং আর কম্পিউটার শিখে আসতে। রান্নার কথা লেখেননি। আমতা আমতা করে বলল, না শিখে এলেও শিখতে সময় লাগবেনা বলে চোখ তুলে তাকাতেই তার চোখ গেল লোকটার খালি গায়ের ডানদিকে। পাজরের পাশে একটা বড় কাটা দাগ।

আপনার ওই এতবড় দাগ কিসের?

গুলির দাগ। এদিকেরটা অপারেশন করে বের করেছে, আর ঘাড়েরটা বের করতে পারেনি। এখনও আছে।

বলেন কি! ঘাড়ে এখনও গুলি আছে? কি করে লাগল? মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন বুঝি?

না না, মুক্তিযুদ্ধে না, এখানেই।

এখানে কিভাবে হল?

রাতে ঘরে ফেরার সময় সাবওয়েতে গুলি করেছিল। পকেটে সেদিন পয়সা ছিলনা। তাই।

বুঝলাম না কথাটা চাচা। একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?

আলম বলল, সব সময় পকেটে কম পক্ষে দশ ডলার রাখতে হয়। রাস্তায় বা সাবওয়েতে চাওয়ামাত্র দিয়ে দিতে হয়। না থাকলে খুব মারে। মাঝে মাঝে গুলি করে দেয়। পকেটে সেদিন টাকা ছিলনা। তাই গুলি করে দিয়েছে। দশ ডলার থাকলে অবশ্য কিছুই হতনা। ওরা কিন্তু বেশি চায়না। তাছাড়া ওরা জানে কেউ দশ/বিশ ডলারের বেশি নিয়ে ঘর থেকে বের হয়না। তাদের রেট দশ/বিশ ডলার।

আনিস কোন্ সময় একেবারে আলমের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সে নিজেই টের পায়নি। জিজ্ঞেস করল, ওরা কারা?

কাউলারা। আগে শুধু কাউলারাই ছিল মাগার মানে ছিনতাইকারি। এখন স্পেনিশ,মেক্সিকান এমন কি চাইনিজদের নামও শোনা যায়। একা পেলেই ধরে। দিনে রাতে কোন কথা নেই। তবে রাতটা বেশি ভয়।

পুলিশ নেই?

পুলিশ কি করবে? কয়জনকে ধরবে? পুলিশ নিজেরাই ভয়ে মরে। প্রতিদিন গড়ে দুজন করে পুলিশ খুন হয় মাগারদের হাতে। খবরের কাগজ খুললেই দেখবে অমুক জায়গায় পুলিশ খুন। খুনিকে ধরার জন্য

পুরস্কার ঘোষনা করে। নিজেরা ধরতে পারেনা বলে। পুলিশ সব দেশেই এক। তবে এদেশের অপরাধীরা পুলিশ খুন করতে দ্বিধা করেনা। অন্য কোন দেশে এত পুলিশ খুন হয়না।

আপনারা এখানে থাকেন কেন। অন্য কোন ভাল জায়গায় চলে যান।

কোথায় যাবা? কম বেশি সব জায়গায়ই ছিনতাই হয়, খুন হয়। এখানে কাউলা বেশি, তাই একটু বেশি ঝামেলা হয়। কোথায়ও নিরাপত্তা নেই। তাছাড়া অন্য কোথায়ও এত কম ভাড়ায় ঘর পাবেনা। তোমার চাচা এই বাসাতেই আগে থাকতেন। বিয়ে করার পর চলে গেছেন। এখন আমরা দু'জন আছি। গুলি খেয়েও ছাড়তে পারিনা।

আর ঐ সাবওয়ে না কি যেন বললেন, ওখানে না গেলে হয়না?

না, সাবওয়ে ছাড়া তুমি চলতেই পারবেনা এই নিউইয়র্ক শহরে। সব কাজ কর্ম, অফিস আদালত বন্ধ হয়ে যাবে সাবওয়ে না থাকলে।

ওটা কি?

তখন করিম এগিয়ে এল। বলল, সাবওয়ে হল পাতালপুরীর রেল পথ। নিউইয়র্ক শহরের প্রধান যাতায়ত ব্যবস্থা।

পাতালপুরীর রেলপথকে সাবওয়ে বলে? পাতালপুরীর রেলপথের কথা আনিস অনেক শুনেছে। তার দেখার অনেক দিনের সখ। কেমন করে মাইলের পর মাইল রেলপথ চলে গেছে মাটির নীচে দিয়ে। পাতালপুরীর রেলের কথা মনে হলে তার মনে পড়ে যায় পাতালপুরীর রাজকন্যার কথা। ছোট বেলায় কিচ্ছা শুনেছে। পাতালে গিয়ে বহু দৈত্য কতল করে তারপর রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনা। কিন্তু এই পাতালে এত মাগিং হয়! করিমকে বলল, চাচা, আমার দেখার খুব সখ এই পাতালপুরীর রেলপথ। কখন দেখা যাবে?

সকালে আমরা যখন কাজে যাই তখন তুমি আমাদের সাথে চল। সারাদিন ঘুরে ঘুরে দেখবে। আবার আমাদের সাথে চলে আসবে। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। আনিস ধরে নিয়েছে নিশ্চয়ই চাচার ফোন। করিম চাচা ফোন উঠাল। না, সারেং চাচা নন।

আনিসের দশ বছরের কল্পনা। এখন বাস্তবে রূপ নেবে। একটা একটা করে। তাই করিমকে জিজ্ঞেস করল, করিম চাচা, চাচার কয়টা গাড়ী?

তোমার চাচার একটাই ভ্যান, গাড়ী নাই।

গাড়ী নাই? তাহলে চাচা অফিসে যায় কি করে?

অফিস? অফিস কোথায়? ওনার তো কোন অফিস নাই।

তাহলে আপনারা কাজ করেন কোথায়? চাচার কোম্পানীতে নয়? আর অফিস ছাড়া কোম্পানী হয় কি করে?

ও, তুমি কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর কথা বলছ? এটা তো ওনার ভ্যানের মধ্যেই। কনস্ট্রাকশনের জন্য যত জিনিষ লাগে সব ভ্যানের মধ্যে আছে।

ভ্যানের মধ্যে অফিস? কত জন লোক কাজ করে কোম্পানীতে?

এইতো আমি, আলম আর তোমার চাচা।

চাচা কাজ করেন? এই তিনজনের কোম্পানী?

কাজ করবেনা কেন? নিজে কাজ না করলে যে কোন ব্যবসা ভাল হয়না। কাজ না জানলে সে ব্যবসা শুরু করলে কয়দিনের মাঝেই লালবাতি জ্বলে যাবে। এটা বাংলাদেশ নয় যে একটা অফিস খুলে নিজে লোক পাঠিয়ে দিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবে। এখানে কাজ ছাড়া কোন কথা নেই। মালিকই হোক আর কর্মচারিই হোক, কাজ করতেই হবে। তোমার চাচাও একদিন নিজে অন্য জায়গায় কাজ করে শিখেছে, তারপর নিজের কোম্পানী শুরু করেছে। আর তিনি কোম্পানী করেছেন বলে

আমরা কাগজ ছাড়া কাজ করতে পারছি। দেশে টাকা পাঠাতে পারছি। কাগজ ছাড়া আমাদের অন্য কোথায়ও কাজ দেয়না।

কাগজ নেই মানে?

কাগজ নেই মানে আমাদের কাজ করার কোন অনুমতি নেই। আমরা এদেশে অবৈধ। এই যেমন ধর তুমি এসেছ ওপি ওয়ান ভিসায়। সব কাগজপত্র হয়ে যাবে। গ্রীন কার্ড পেয়ে যাবে। তারপর এদেশের নাগরিক। কিন্তু আমাদের কাগজ নেই। কাজ করার অনুমতি নেই। কেউ কাজ দিলে আর ধরা পড়লে সে মালিকের দশ হাজার ডলার জরিমানা। তারপরও মানুষ কাজ পায়। তবে পানির দামে। যেখানে ঘন্টায় মিনিমাম পাঁচ ডলার দিতে হয় সেখানে কাগজ না থাকলে দেবে দু ডলার। আর যাদের কাগজ নেই তারা মনে করে বসে থাকার চেয়ে দু ডলারই ভাল। এসব কাজ শুধু দেশী লোকের কাছেই পাওয়া যায়। আর দেশের মানুষই দেশের মানুষকে ঠকিয়ে আসছে। বাংগালী রেস্টুরেন্ট আছে সিক্সথ স্ট্রিটে। ডজনের উপর। শুনেছি এক বাংগালী অসুবিধায় পড়েছে। প্রায় না খেয়ে থাকার অবস্থা। সে আট ঘন্টা কাজ করে শুধু খাওয়ার বদলে। এক সপ্তাহে তাকে পকেট খরচ দেয় বিশ ডলার। এমনি কাগজ ছাড়াদের অবস্থা। সারেং ভাইএর সাথে আমরা ভাল আছি। তিনি মানুষকে ঠকান না।

আপনার আসলেন কেমন করে এ দেশে?

এসব কথা জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। যে যেভাবে পারে চলে আসে। এটা স্বপ্নের দেশ। অনেকে অনেক স্বপ্ন নিয়ে আসে এ দেশে। একবার এসে পৌঁছাতে পারলে আর ফিরে যাবার নাম করেনা। যত কষ্টই হোক, থেকে যায়। তোমার চাচা এসেছিলেন জাহাজ থেকে লাফ দিয়ে। এমন হাজার মানুষ আছে জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়েছে। তাদেরকে বলে শিপ জাম্পার। কেউ এসেছে বর্ডার দিয়ে লুকিয়ে। আমি এসেছি গলা কেটে। আলম এসেছে ভিজিট ভিসায়। এমনি হাজার ভাবে মানুষ আসে এ দেশে। এই স্বপ্নের দেশে। যাদের ভাগ্য ভাল তারা কাগজ করে নিতে পারে। যারা পারেনা তারা কষ্ট করে।

গলা কেটে মানে?

গলা কেটে মানে আর একজনের পাসপোর্ট ছবি বদল করে। ছবিটার সবটা বদল হয়না। শুধু গলা বরাবর কেটে মাথাটা বসিয়ে দেয়। বডি যেমন তেমনই থাকে।

আলম বলল, এসব কথা আস্তে আস্তে সব জানবে। আস এখন খাওয়া যাক। খাবার রেডি।

ছোট্ট টেবিলটায় তিনজনের বসতে খুব অসুবিধা হয়। তাই আলম প্লেটে খাবার নিয়ে চলে গেল বিছানায়। আনিস জিজ্ঞেস করল, চাচা এটা কিসের মাংস?

মুরগীর মাংস। কাজ থেকে এসে মুরগী রান্না করতেই সুবিধা। কয়েক মিনিটেই রান্না হয়ে যায়। ঝামেলা কম।

এমন বুসকা গন্ধ কেন? কিসের মুরগী এগুলো?

এগুলো ফার্মের মুরগী। শুধু মুরগী নয়, অনেক জিনিষেই এমন একটা গন্ধ পাবা যা একবার খেলে আর খেতে ইচ্ছে করবেনা। কিন্তু উপায় নেই। খেতেই হবে। আর খেতে খেতে একদিন দেখবে সে বুসকা গন্ধ আর নেই। সব সয়ে গেছে।

আনিস মনে মনে বলল, স্বপ্নে কোন দিন এমন মুরগী খাই নাই। তাহলে সত্যি সত্যি এসে গেছি।

চাচা এলেন রাত দশটায়। বিছানায় বসে আলাপ করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল আনিস টের পায়নি। করিমের ডাকে চোখ মেলে দেখল সামনে একটা চেয়ারে বসে চাচা মিটি মিটি হাসছেন। আনিস ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষন। মুখ দিয়ে কোন কথা বের হলনা। দশ বছর আগে দেখা চাচা আর সামনে বসে থাকা চাচার কোন মিল নেই। গলার কণ্ঠি বের হয়ে চামড়া ঝুলে গেছে। চোখের তারা কপালের ভেতর ঢুকে গিয়ে চারপাশে আঁধার করে আছে। গালের চামড়া ঝুলে নাকের দুদিকে দুটো তলোয়ারের ছবি আঁকা। মাথার পেছনে কয়েকটা সাদা চুল কোন রকমে লেগে আছে। আনিস তাড়াতাড়ি করে উঠে বসতেই চাচা বললেন -

শুয়ে থাক, শুয়েই কথা বল। এখন তোমার ঘুমের প্রয়োজন। বার ঘন্টার ব্যবধান। সময় এডজাস্ট করতে কয়েকদিন লাগবে। এয়ারপোর্ট থেকে আসতে অসুবিধা হয়নি তো? আমি যেতে পারিনি কারণ এখন হাতে যে কাজটা আছে তা আগামি তিন দিনের মাঝে শেষ করতে হবে। আর শেষ করতে না পারলে বিলটা সময় মত পাবনা। তাছাড়া আজকে আর একটা এস্টিমেট দাখিল করার কথা ছিল। আশা করি সে কাজটাও পেয়ে যাব। তারপর তিনি বাড়ীর খবর, দেশের খবর নিতে লাগলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব আত্নীয়স্বজনের খবর নিলেন। এই দশ বছরে কোন কোন আত্নীয়পরিজন পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেলেন, নতুন করে কারা কোথায় কি করছে সব খবর। কখনও তাঁর চেহারা বিমর্ষ দেখায়, আবার সুখবরে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। মাঝে মাঝে একটু চুপ করে থাকেন। আবার শুরু করেন। তারপর এক সময় ফিরে এলেন তাঁর নিজের কথায়।

বললেন, দেখ আনিস, তোমাকে এখানে থাকার ব্যবস্থা করেছি বলে কিন্তু ভুল বুঝনা। আমার সাথে থাকলে তুমি খাওয়াদাওয়ায় কষ্ট করবে। তাই করিম ভাইএর সাথে ব্যবস্থা করেছি। তুমি বাংলাদেশ থেকে এসেছ। মাছ ভাত খেতে অভ্যস্থ। আমার সাথে থাকলে এসবের মুখ দেখবেনা। কারণ তোমার চাচি ভাত খায়না। মাঝে মধ্যে যা খায় সে ভাত আমাদের ভাত নয়। আমিও এসব খেতে অভ্যস্থ হয়ে গেছি। আমার যদি বাঙালী খাবার খেতে খুব ইচ্ছে হয় তখন নিজেই রান্না করে নিই। তাও মাসে একবার হয় কিনা সন্দেহ। আমাদের বাংগালী ভাত না খেতে পারলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমি অনেক আগে থেকেই ভাত না খেয়ে অভ্যস্থ। আমার অসুবিধা হয়না। তোমার চাচি আগে থেকেই বলছিল। বলছিল তোমার যাতে অসুবিধা না হয় সে ব্যবস্থা করতে। তাই আমি এ ব্যবস্থা করেছি। এখানে তুমি তোমার ইচ্ছেমতা খেতে পারবে, একটা স্বাধীনতা থাকবে। তবে তোমার টাকা পয়সার জন্য কোন অসুবিধা হবেনা। আমি আছি। কিন্তু তোমার চাচীই দিতে চায়। তার ছেলেমেয়ে নেই। খুব ভাল চাকরি করে। তোমার জন্য খরচ করতে পারলে সে খুশি হয়। তোমাকে সবদিক দিয়ে উপদেশ দিতে পারবে। আজ সে ক্লান্ত, তুমিও। আগামি কাল চল তার সাথে দেখা করবে। কাল রাতে আমার ওখানে খাবে। আমি এসে নিয়ে যাব। তারপর চাচা উঠলেন।

চাচা চলে যাবার পর আনিস কল্পনায় চাচির চেহারাটা একবার দেখে নিল। সে দেখতে পেল চাচি যেন এক দয়ার সাগর। অনিন্দ্য সুন্দরী, যে চেহারা দেখলে শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। এমনি ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

- ৩ -

ঘুম ভাঙল পরদিন বিকেলে। তিন দিনের ঘুম শেষ করে আনিস উঠে দেখল ঘরে কেউ নেই। ছোট্ট টেবিলটায় একটা প্লেটে দু টুকরো রুটি আর একটা ডিম। হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সকাল না বিকেল কিছুই ঠাহর করতে পারল না। তবে রোদের রং দেখে সে বুঝে নিল এ পড়ন্ত বিকেল। একটু পরেই হয়ত করিম চাচারা আসবেন। তাদের অপেক্ষায় বসে রইল।

অনেকক্ষণ পর তারা এলেন। তবে সারেং চাচা সাথে। এসেই বললেন, চল, তৈরি হয়ে নাও।

দু মিনিটেই আনিস তৈরী হয়ে চাচার সাথে রওয়ানা দিল। চাচার গাড়ি মানে ভ্যান দরজার সামনেই দাড়ানো ছিল। আনিস তাকিয়ে দেখল বড় করে লেখা আছে "সারেং কনষ্ট্রাকশন কোং, ৬০-২৩ নষ্ট্রেন্ড এভিনিউ, নিউ ইয়র্ক, ফোন: (৭১৮) ২৩৫-৬৭২৮"। চাচার পাশেই বসতে হল। পেছনে তাকিয়ে দেখল খুন্তি কোদাল থেকে ঝাড় পর্যন্ত কনস্ট্রাকশনের যাবতীয় যন্ত্রপাতি। একদিকে কতগুলো বস্তা, কিছু ছোট, কিছু বেশ বড়। ভ্যানের গায়ে বহু রকমের রং লেগে এখন এটা মালটি কালার হয়ে আছে। ভ্যানের উপরে একটা মই। সামনে কোন রকমে ড্রাইভার সহ দুজন বসতে পারে। প্রয়োজনে বোধ হয় পেছনেও বসার ব্যবস্থা আছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তারা এসে পৌছে গেল চাচার বাসায়।

তিন তলায় উঠে চাচা বেল টিপলেন। দরজা খুলে দিল এক আফ্রিকান কৃষ্ণবর্ণ মহিলা। বয়স পঞ্চাশের উপর হবে। বব কাটা চুল। মনে হয় কোনদিন তেল পড়েনি। পড়নে হাতা কাটা মেক্সি টাইপের কাপড় যা হাটুর উপরেই শেষ। আনিস ভাবল হয়ত কাজের মেয়ে। যখন চাচা পরিচয় করিয়ে দিল, এই তোমার চাচী, সুসান। সুসানকে বলল, নেফিউ আনিস - তখন সে আকাশ থেকে পড়ল। তার মনের অসন্তুষ্টি মুখের উপর ছাপ ফেলে গেল চকিতে যা তার চাচার নজর এড়ায়নি। তার কল্পনার সাথে এ মহিলার কোনই মিল খুঁজে পেলনা। কয়েক মুহূর্ত তার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হলনা।

সুসান বলল, বস। কি খাবে? চা? কফি? হ্যাম বারগার? স্যান্ডুইচ? কেক?

আনিস তার চাচার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে যে বাংলা বলে! জিজ্ঞেস করল, আপনি বাংলা জানেন?

চাচা বললেন, বাংলা কিছু শিখিয়ে নিয়েছি। তার নিজেরও ইচেছ, দেশে যাবে বেড়াতে। তখন যাতে বাংলা চালিয়ে নিতে পারে সেটুকুই শিখেছে।

আনিস চাচীর দিকে তাকিয়ে বলল, আপাততঃ কফি, পরে হ্যামবারগার।

সুসান কিচেনে চলে গেল।

আনিস চোখ বুলিয়ে একবার সমস্ত ঘরটা দেখে নিল। দামী আসবাব পত্র, সুন্দরভাবে গোছানো এবং পরিপাটি করে সাজানো। বোঝা যায় সবকিছুতেই একটা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং যত্নের ছাপ লেগে আছে। মেঝেতে দামি কার্পেট। ওয়ালে বিশ্বের নামী শিল্পীর চিত্র টাঙ্গানো। সবকিছু ঝক ঝকে তক তকে।

চাচা বললেন, তোমার চেহারা দেখে মনে হল তোমার চাচীকে দেখে তোমার মন ভরেনি। আমার বয়স এখন সত্তরের কাছাকছি। আমি পৃথিবীটা দেখেছি। কত দেশ, কত মানুষ, কত ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি তার হিসেব নেই। মানুষের সাথে মিশে মানুষ চেনার সুযোগ হয়েছে প্রচুর। তোমার বয়স কম। বাংলাদেশের মনোবৃত্তি নিয়ে তুমি যাচাই করবে সবকিছু। কিন্তু আমি করব আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে। এই বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করার প্রয়োজনই ছিলনা। তারপরও কেন করলাম তা বলব।

বাবাকে দেখিনি কোনদিন। যাকে বাবার মত পেয়েছিলাম ছোটবেলা থেকে, আদর স্নেহ দিয়ে যিনি আমাকে মানুষ করতে চেয়েছিলেন সে হলো আমার বড় ভাই, তোমার বাবা। তখন প্রাইমারি স্কুলের একজন শিক্ষকের পক্ষে শুধু বেতন দিয়ে সংসার চালানো ছিল অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। তারপরও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিভাবে চালিয়ে যাচ্ছিলেন সে অনেক পরে বুঝেছিলাম। আমার লেখাপড়ায় মন ছিলনা কোনদিনই। কিন্তু ভাইজান বলতেন, আমি লেখাপড়া করতে পারিনি, কিন্তু তোমাকে করতে হবে। যেভাবেই হোক তোমার লেখাপড়ার খরচ জোগাড় হবে। আমি তাঁর সে আশার গুড়ে বালি দিলাম। একদিন লুকিয়ে চলে গেলাম বাড়ী থেকে। চট্টগ্রামের জাহাজ ঘাটে অনেকদিন কুলির কাজ করেছি। একদিন সুযোগ পেয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম জাহাজে খালাসির কাজে। শুরু হল নাবিকের জীবন। বন্দর থেকে বন্দরে। ভাইজানের মৃত্যুর খবর যখন পাই তখন আমি হল্যান্ডে। তার তিন মাস পর তোমার জন্ম। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম।তোমাদের দায়ীত্ব আমি নেব। আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছি। তোমাদের অনেক কষ্ট লাঘব করতে পেরে মনে মনে শান্তি পাই। বিশেষ করে যখন ভাবি যে আমি লেখাপড়া শিখতে পারিনি, কিন্তু আমার আনিসকে তো এম এ পাশ করিয়েছি! তখন বুকটা গর্বে ফুলে উঠে।

আমি কি বলতে কি শুরু করে দিলাম। বলছিলাম আমার বিয়ের কথা। এক সময় আমি বিয়ের কথা ভুলেই গেলাম। তাছাড়া টাকাপয়সাও হাতে কোনদিন জমেনি। তাতে আরও একটা সুবিধা হল। মানুষের হাতে টাকাপয়সা আসলেই প্রথম এ চিন্তাটা আসে। আমার হাতে টাকা না থাকায় বিয়ের কথাটা একবারেই চাপা পড়ে গেল।

একদিন জাহাজ থেকে লাফ দিলাম এই নিউইয়র্কে। অনেক কষ্টে, অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা উৎরে এক সময় যখন জীবনযুদ্ধে প্রায় পরাজিত, হাল ছেড়ে দেবার অবস্থা তখন সুসানের সাথে পরিচয়। একটা গ্রোসারি স্টোরে। ইন্ডিয়ান সম্মন্ধে তার ভাল ধারণা। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব।

আমরা একে অপরের দুঃখের কথা শুনতাম। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। ঘর বাধাঁর তার কত স্বপ্ন ছিল, কত চেষ্টা ছিল। যা সাধারণত বিদেশীরা করেনা। তারা ঘর বাধে ক্ষনিকের জন্য। সামান্য পান থেকে চুন খসলেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কিন্তু সুসান ভিন্ন প্রকৃতির মেয়ে। বার বার ঘর বাধতে গিয়ে বিয়ে করেছে, তার সবকিছু উজার করে দিয়ে আগলে রাখতে চেয়েছে। আর বার বার ব্যর্থ হয়েছে। প্রত্যেকটা লোক তার সাথে জোচ্চুরি করে, তার টাকা পয়সা হাতিয়ে সরে পড়েছে। তখন তার আর বিয়ের বয়সও নেই। এদিকে আমারও নেই। সে নিজে থেকেই একদিন প্রস্তাব দিল - চল বন্ধু, আমরা ঘর বাঁধি। আমাদের দুজনেরই সাথী প্রয়োজন।

তার কাছ থেকে কয়েকদিন সময় চেয়ে নিয়ে ভাবলাম। দেখলাম আমার হারানোর মত কিছু নেই। বরং আমি অনেক লাভবান হব। তখন

আমি এদেশে অবৈধ। বিয়ে করলে গ্রীনকার্ড পাব, তোমাকে এদেশে আনতে পারব। আর তোমাকে এখানে আনতে পারা মানে আমার সব চাওয়ার শেষ হয়ে যাওয়া। তাছাড়া তারও কোন ছেলে মেয়ে নেই, আমারও নেই। তার প্রস্তাবে রাজি হলাম, সেও আমার প্রস্তাবে রাজী হল।

আমার প্রস্তাব ছিল সে মুসলমান হবে, নামাজ রোজা করবে, তোমাকে আমার ছেলের মত মনে করবে। সে সবকিছুই ঠিকভাবে চলছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, বাংলা শেখে। আমাকে ব্যবসা করার সব ব্যবস্থা সে করেছে। তার নিজের দুটো বাড়ী আছে। এই বাড়ী তার নিজের। এমনি আরও একটা আছে। এসব চিন্তা করেই এই কুৎসিত মহিলাকে বিয়ে করেছি। বউ নয়, সাথী করেছি। জীবন তো প্রায় শেষ।

আনিস একটা কথাও বলতে পারলনা। ফ্যাল ফ্যাল করে চাচার দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হল তার চোখের পাতা ভিজে উঠেছে। এমন সময় সুসান ট্রে নিয়ে টেবিলে রাখল।

ট্রে থেকে একটা একটা করে নামিয়ে টেবিলে রাখল। একটা পিরিচে কেক, একটায় কিছু বিস্কুট নামিয়ে আনিসের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নাও, কফি নাও। আজ আমাদের সাথে এখানে ডিনার করে যাবে। যদিও আমি তোমাদের খাবার তৈরী করতে অভ্যস্ত নই। রহমান তৈরী করবে। ও মাঝে মাঝে তৈরী করে নিজে খায়। আমি টেস্ট করি। খুব হট। খাওয়া যায়না। হট পেপার না দিলে খুব স্বাদ হয়। আরও খেতে ইচ্ছে হয়। তাই এখন আমার জন্য সে হট পেপার খেতে পারেনা। ইন্ডিয়ান ফুড আমাদের এখানে কম হয়। তোমার চাচা যখন ইচেছ হয় তখন নিজেই তৈরী করে নেয়।

তারপর শুরু হল আনিস সম্বন্ধে জানা। কি পাশ করেছে, কত ক্লাশ পর্যন্ত, টেকনিক্যাল কি জানে ইত্যাদি। যখন শুনল আনিস ইংলিশে এম এ তখন খুব খুশি হল। বলল, তোমার ইংরেজি শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি।

এ সময় চাচা উঠে রান্নাঘরে চলে গেলেন। বলে গেলেন তোমরা কথা বল, আমি রান্নাটা শেষ করি।

সুসান বলল, শোন আনিস, আমার কোন ছেলেপেলে নেই। আমার ইচ্ছা জাগে কেউ আমাকে মা বলে ডাকুক। আমার ইচ্ছা হয় মা হতে। রহমান মনে করে তুমি তার ছেলে। তাই আমিও মনে করি তুমি আমার ছেলের মত। তোমার মা এখানে নেই। তুমি মনে করবে আমি আছি তোমার মায়ের মত। যখন যা প্রয়োজন আমাকে বলতে লজ্জা করো না। এই শহরে থাকতে হলে প্রথমেই তোমাকে রাস্তাঘাট ভাল করে চিনতে হবে। পথঘাট চেনার সহজ একটা ব্যবস্থা হল সাবওয়ে ম্যাপ। এটা যদি ভাল করে বুঝে নাও তাহলে চলাফেরা করতে অসুবিধে হবেনা। এই হল সাবওয়ে ম্যাপ, বলে ছোট একটা ম্যাপ টেবিলের উপর ছড়িয়ে দিল। বলল, আমার কাছে এসে বস এবং দেখ।

আনিসকে বোঝাতে লাগল কিভাবে এই ম্যাপ ব্যবহার করতে হয়। বুঝলে একেবারে সোজা। নিউইয়র্কের সবচেয়ে কম খরচে, সহজ ভাবে চলাফেরার একমাত্র যাতায়ত ব্যবস্থা এই সাবওয়ে। বিশেষ করে ম্যানহাটানে। কাজের স্থানই হল ম্যানহাটান। নিউইয়র্কের প্রাণ। এই হল ফিফথ এভ্যিনিউ। শহরকে দুভাগ করে দক্ষিন থেকে শুরু করে উত্তরে চলে গেছে। তার বাদিকে পশ্চিম আর ডান দিকে পূর্ব। ইষ্ট এন্ড ওয়েষ্ট। এই ফিফথ এভ্যিনিউকে ক্রস করেছে ষ্ট্রিটগুলো। যদি তোমাকে ঠিকানা দেয়া হয় ২২ ইষ্ট, ৪৪ ষ্ট্রিট তার মানে ফিফথ এভ্যিনিউর ধরে

৪৪ ষ্ট্রিট যাবে। ৪৪ ষ্ট্রিটে গিয়ে ঠিক করবে ইষ্ট যাবে না ওয়েষ্ট যাবে। ডানে হল ইষ্ট। ডানে গিয়ে ২২ নম্বর বাড়ী বের করবে। সবগুলো এভিনিউ গেছে দক্ষিন থেকে উত্তরে। এমনি ভাবে বেশ কিছু সময় ধরে কোন ট্রেন নিয়ে কোথায় কিভাবে যেতে হবে, ট্রেনের নাম্বার ইত্যাদি সবকিছুর একটা ধারনা দিল। কিছুক্ষণের মাঝেই আনিস বুঝে ফেলল। তারপর সুসান প্রশ্ন করতে লাগল, ধর তুমি সেন্ট্রাল পার্কে যাবে, এখান থেকে কোন ট্রেন নিবে?

আনিস বলল, 'এ' ট্রেন।

গুড! তারপর আরও কয়েকটা প্রশ্ন করে ম্যাপটা আনিসের হাতে দিয়ে বলল, এখানে মানুষ আসে স্বপ্ন নিয়ে, স্বপ্ন পূরন করতে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ, ধনী শহর। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি খরচের শহর। সবচেয়ে বেশি আয়ের নগর। সবচেয়ে ধনীর বাস, আবার গরীব নিঃস্ব মানুষের বাস। সৎ ভাল মানুষের বসবাস এখানে আবার পৃথিবীর বড় বড় ক্রিমিনালদের স্বর্গভুমি এ নগর। তোমার ভাগ্য তৈরি করবে তোমার কর্ম। তুমি যে কর্ম করবে তার ফল তুমিই ভোগ করবে, অন্য কেউ নয়। এখানে তুমি তোমার ভাগ্যকে গড়তে পার, ভাঙতে পার। উন্নতির উচ্চশিখরে পৌঁছতে পার আবার কদর্যের শেষ ধাপে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পার। ভাগ্য বলতে কিছু নেই। ম্যান ইজ দি মেইকার অব হিজ উওন ফেইট। তোমার ভাগ্য তুমি তৈরী করবে। এখানে নেই এমন কোন জিনিষ নেই। নির্ভর করছে তুমি কি চাও? কোন্ স্রোতের সাথে তুমি মিশবে? তুমি স্বাধীন। এবার তোমার পথ তুমি বেছে নাও। স্থির কর কি করবে। চাকরি? লেখাপড়া? কোন্টা? এই শহর, শহরের মানুষ, পথঘাট, চাকরির বাজার এসব দেখে স্থির কর। তোমার কোন পিছুটান নেই। তিন মাস সময় নাও। তোমার যা লাগে আমি আছি তোমার পেছনে। তোমার চাচা আছেন।

আনিস চুপ করে রইল। একটা কথাও বলতে পারলনা।

এমন সময় সারেং চাচা এসে বললেন, ডিনার রেডি।

ডিনার টেবিলে বসে আনিস অবাক হয়ে গেল। দুরকমের ভাত, একটা ফ্রাই করা, ডিম দিয়ে, আর একটা সাদা ভাত। একটা সব্জি, গরুর মাংশ, তার পাশে বাংলাদেশের মাছ! তাও আবার পাবদা! জিজ্ঞেস করল, চাচা পাবদা মাছ কোথায় পেলেন?

সব পাওয়া যায় বাবা। এখানে বাঙালী গ্রোসারি আছে। পাটালি গুড় থেকে পান-শুপারি সব পাওয়া যায়। বাংলাদেশে যা পাওয়া যায়না তাও এখানে পাবে। সব রকমের মাছ, বাংলাদেশের তরিতরকারী, মসলা পাতি সব। তোমাকে নিয়ে যাব বাঙালি গ্রোসারিতে। বাঙালীরা এখন সব ব্যবসাতেই নেমে গেছে। বিউটি সেলুন থেকে শুরু করে হোটেল রেস্টুরেন্ট, ট্র্যাভেল এজেন্সী, খবরের কাগজ আমদানি রফতানি, আদম বেপারি ইত্যাদি সব আছে। আস্তে আস্তে সব জানবে দেখবে। দেখবে এখানে আমাদের কত ব্যবসা, কত সংগঠন, কত কর্মকান্ড।

৪-

এখানে সব পাওয়া যায়। পান-শুপারি থেকে চেপা শুটকী পর্যন্ত। বাংলাদেশের বাজারে যা নেই এখানে তা পাওয়া যায়। বাঙালী গেড়ে বসেছে। যে যেখানে পারে। পৃথিবীর চলমান স্রোতে ভাসিয়ে দিচ্ছে নিজেকে। বিশেষ করে স্বাধীনতার পর। স্বাধীনতার ফসল। সহজলভ্য পাসপোর্ট আর যোগাযোগ ব্যবস্থা। বাঙালীকে টেনে নিয়ে গেছে ঘরের

বাইরে। বাঙালী বেরিয়ে পড়েছে। দূরের হাতছানিতে যে যেদিকে সুযোগ পেয়েছে সেখানেই নোঙ্গর ফেলেছে। জার্মান, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, লন্ডন, ক্যানাডা, ইটালি, আমেরিকা। কিন্তু নিউইয়র্কেই বাঙালীর সংখ্যা বেশি। নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ, ম্যানহাটনের ডাউন টাউন, কুইন্সের এষ্ট্যরিয়া, ওজন পার্ক, ফ্লাশিং, জ্যামাইকা এবং আপার ব্রঙ্কসের রাস্তায় বেরোলে বোঝা যায় বাঙালী আর ঘরকুনো নয়। ছেড়েছে। দেশ ছেড়েছে, পৈতৃক ভিটার মায়া ছেড়েছে। আধুনিক পৃথিবীর স্রোতের সাথে মিশে যাচ্ছে বাঙালীর স্রোত।

বাঙালী যেখানেই নোঙ্গর ফেলেছে সেখানেই নিজের আপন পরিবেশ তৈরি করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। ভুলে থাকতে চেয়েছে ফেলে আসা আজীবনের পরিবেশ। এই নিউইয়র্ক শহরে বাঙালী নিজেদের পরিবেশ তৈরি করতে গিয়ে প্রথমেই নিজের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছে। আমদানি করেছে নিজেদের খাবার নিজের দেশ থেকে। ব্যবস্থা করেছে হালাল খাবার। তারপর তৈরি করেছে সংগঠন। নিজেদের যোগ্যতানুযায়ী নিজ নিজ ক্ষেত্রে।

তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, ধর্মীয় ও কল্যাণমূলক সংগঠন। বাংলা শেখার পাঠশালা, নাচ গানের স্কুল ইত্যাদি গঠন করে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছে তাদের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে। নিজেদেরকে আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত রেখে দেশের পরিবেশের অভাবকে ভুলে থাকতে চেয়েছে। ভুলে থাকতে চেয়েছে এবং প্রমাণ করতে চেয়েছে এই প্রবাসীরা নির্বাসিত নয়। সে তার নিজের তৈরি পরিবেশে স্বনির্বাসনে পরিতৃপ্ত আছে নিজের সাংস্কৃতিক জগত নিয়ে।

পৃথিবীর আর সব মানুষের মত বাঙালীরাও জোটবদ্ধ থাকতে চায়। যেখানে একজন বাঙালী বাস করে আর একজনকে নিয়ে যায় তার কাছাকাছি বা সে নিজে থেকে চলে যায়। একটা টানে। মাটির টান, ভাষার টান, আর হৃদয়ের টানে। একের পাশে আর এক। জমে জমে একটা এলাকা হয়ে যায় তাদের। এই কাছাকাছি থাকতে গিয়ে ঝগড়া হয়, মনোমালিন্য হয়, মুখ দেখাদেখি বন্ধ থাকে। একজনকে আর এক জন খুন করতেও পারে, আবার এক জন আর এক জনের জন্য জীবন দিতেও দ্বিধা করে না। কোন বিদেশির আক্রমনে সবাই এক জোট। তখন সব মনোমালিন্য ভুলে এক হয়ে যায় সকলে। সুখে দুখে একে অপরের ভাগি। এমনি থাকতে থাকতে নিজেদের একটা পরিবেশ তৈরি করে নেয়। তৈরি হয়ে যায়।

কবে কোন্ বাঙালি সেচ্ছা-নির্বাসনের অভিলাষে সর্বপ্রথম আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এই স্বপ্নের দেশে নোঙ্গর করেছিল তা নিশ্চিত করে বলা যাবেনা। যতটুকু জানা যায় আমেরিকায় প্রথম বাঙালির আগমন ১৭৭০ দশকে। ফ্রান্স-ইন্ডিয়ান যুদ্ধের পর স্যার এডওয়ার্ড রায়ান মিশন স্থির করেন নর্থ আমেরিকায় চা উৎপাদনের জন্য বাংলা থেকে ক্রীতদাস আমদানি করার। চট্রগ্রাম, আসাম বা সিলেটের কিছু বাঙালি আমদানি করা হয়। পিটসবার্গে চা উৎপাদন হয়নি বলে ক্রীতদাসদের পাঠানো হয় সাভানাতে। সেখানেও উৎপাদন হয়নি। পরবর্তিতে এই সব ক্রীতদাসকে ওয়েষ্ট ইন্ডিজে পাঠানো হয় তুলা উৎপাদনে। এদের কিছু সংখ্যক পেনস্যালভেনিয়া এবং সাভানাতে থেকে যায়।

১৮০০ সালের দিকে বাঙালী খালাসিরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সমুদ্রের বুকে জাহাজে অবস্থান করে একবারে অতিষ্ট হয়ে যায়। অনির্দিষ্টকালের জন্য তারা তাদের পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন তাদের কেউ কেউ অন্য কাজের চিন্তা করতে থাকে।

খালাসির কাজ ত্যাগ করার জন্য অনেকেই সিদ্ধান্ত নেয় এবং সুযোগ খুঁজতে থাকে কিভাবে এই একঘেয়ে জীবন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাদের লক্ষ হয় লন্ডন নয় নিউইয়র্ক, যে কোন একটাতে সুযোগ পেলেই জাম্প দেবে।

১৮২৩ সালে ব্রিটিশ শিপিং এক্ট ভারত থেকে সস্তা জাহাজের লেবার নিয়োগের অনুমোদন করে। এর ফলে ব্রিটিশ আমেরিকানরা সস্তা লেবার আমদানি করতে লাগল বাংলা থেকে। বিশেষ করে জাহাজের খালাসি এবং অন্যান্য কাজের জন্য। এসব কাজের জন্য সিলেট এবং চট্রগ্রামের অধিবাসিই ছিল প্রধান। জাহাজ চীনের সাথে পশমের বানিজ্য করত, ফেরার পথে কলকাতা থেকে পাট জাতীয় দ্রব্য এবং সূতি বস্ত্র ইত্যাদি নিউইয়র্ক, বোষ্টন বা সাভানাতে চালান করত। কেউ কেউ এইসব বন্দরে জাম্প দেবার সুযোগ গ্রহন করে।

কিছু বাঙালী মহিলা ইমিগ্র্যান্ট এসেছে ব্রিটিশ অফিসারের পত্নি বা উপপত্নি হিসেবে। উদাহরণ স্বরূপ এঙ্গলো-ইন্ডিয়ান এ,সি, সাউদারল্যান্ডের নাম করা যেতে পারে। ১৮৭৪এর দশকে তার ভাই ছিল সিলেট শহরের ম্যাজিস্ট্রেট, তখন আসামের অধীনে। আমেরিকা যাবার পথে সাউদারল্যান্ড তার ভাইর সাথে দেখা করতে যায়। সেখানে কিছুদিন থাকাকালে এক ব্রাক্ষ্মন মহিলার রূপে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। মুগ্ধ হয়ে দগ্ধ হতে থাকে। এবং মহিলাকে বিয়ে না করা পর্যন্ত জ্বালা মিটেনি। স্ত্রী হিসেবে তাকে সাথে নিয়ে যায় আমেরিকার প্যানসালভেনিয়া শহরে।

১৯০৬ থেকে ১৯১০এর মাঝে কয়েকজন বাঙালীর নাম জানা যায়। তাঁদের একজন হলেন তারকনাথ দাস। জন্ম চব্বিশ পরগনায়। ১৮৮৪ সালে। কলেজে থাকা কালীন সময়ে বৈপ্লবিক রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন এবং পুলিশের নজরে পড়েন। গ্রেফতার হবার আগেই জাপান হয়ে ১৯০৬ সালে আমেরিকায় আসেন এবং ভারমন্ট সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি 'ফ্রি হিন্দুস্তান' নামে একটি পত্রিকার মাধ্যমে ভারত স্বাধীনতার কাজ শুরু করেন এবং প্রবাসে ভারতীয়দের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। ১৯১৪ সালে মার্কিন নাগরিকত্ব লাভ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের অস্থায়ী শাসন পরিষদ গঠন করে বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্যের আবেদন করেন। মার্কিন সরকার এই অপরাধের জন্য তাঁকে ২২ মাস কারাদন্ড দেয়। ১৯২৪ সালে তিনি জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ের উপর পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ঐ বছরই তিনি বিবাহ করেন মেরী কিটিনজ নামে একজন মার্কিন মহিলাকে। এ বছরই মার্কিন সরকার তারকনাথ সহ আরও ২৬ জন ভারতীয়দের নাগরিকত্ব বাতিল করে। তারকনাথ আদালতে নালিশ করেন এবং ১৯২৭ সালে সুর্পিম কোর্ট তাঁদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়। ভারতীয় ছাত্রদের বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁর একক প্রচেষ্টায় মিউনিকে "ইন্ডিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট" প্রতিষ্ঠা করেন। এই উদ্দেশ্যে 'তারকনাথ দাস ফাউন্ডেশন'এর উদ্ভব। তিনি বিভিন্ন সময়ে অনেক গুরুত্বপূর্ন পদে আসীন ছিলেন। নিউ ইয়র্ক ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা দিতেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর তিনি কয়েকটি গ্রন্থ প্রনয়ন করেন। ১৯৫৪ সালে ইউনিভার্সিটি অব মিউনিক তাঁকে পি এইচ ডিতে ভুষিত করে। ১৯৫৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

আর একজন হলেন প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। জন্ম ধুবড়ির এক বিশিষ্ট ব্রাহ্ম পরিবারে। কলিকাতা সিটি কলেজে পড়ার সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহন করায় কলেজ ছাড়তে হয়। পুলিশের তাড়নায় ১৯০৬

সালে আমেরিকায় আসেন এবং ১৯১২ সালে পিট্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেটার্লজিতে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। একজন প্রতিষ্ঠিত ধাতুবিদ্যাবিশারদ। অনেক বড় বড় পদ অলংকৃত করেছেন। তিনি 'ফ্রি হিন্দুস্তান' পত্রিকার সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন। তারকনাথের সকল কাজকর্মে সহযোগিতা করেছেন। ১৯১৪ সালে "হিন্দুস্তান টু ডে" বুলেটিনের প্রকাশনায় এবং 'ফ্রেন্ডস অব ফ্রীডম ফর ইন্ডিয়া' সোসাইটি স্থাপনে অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় "টেগোর সোসাইটি"। বাংলা ভাষা, বাঙালি ও তার কবি এবং তার সাহিত্য প্রতিভাকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবার মানসে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন টেগোর সোসাইটি। এর প্রতিষ্ঠালগ্নে আরও যাঁদের নাম জড়িত বলে জানা যায় তাঁরা হলেন প্রফুল্ল মুখার্জির স্ত্রী রোজ মুখার্জি, শরৎ মুখার্জি ও তাঁর স্ত্রী কমলা মুখার্জি এবং রেণুকা বিশ্বাস। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৯ সালে। বাঙালি-অবাঙালি-অন্যান্য ভাষাভাষির মানুষ নিয়ে শুরু করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে বিশ্বের কাছে পৌছে দেবার। তিনি ১৯৭১ সালে প্রবাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহন করেন।

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় আমেরিকায় আসেন ১৯০৮ সালে। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে। তিনি ক্যালিফোর্নীার ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে বি এ পাশ করে সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। সাহিত্য রচনার মাধ্যমে আমেরিকাবাসীর মন ভারতের দিকে আকৃষ্ট করায় সচেষ্ট হন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই 'রজনী' এবং নাটক 'লায়লা মজনু' প্রকাশের পর তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি শিশু সাহিত্যও রচনা করেন। তাঁর 'গে নেক' (চিত্রগ্রীব) ১৯২৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত "জন নিউবেরী" পুরষ্কার লাভ করে। তিনি অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯৩৬ সালে তিনি মানসিক রোগে আত্নহত্যা করেন নিউ ইয়র্কে।

১৮৮০ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত যারা জাম্প দিয়েছে তাদের প্রায় সকলেই ছিল অপেশাজীবি। তারা অবৈধ। ইমিগ্রেশন তাদের খুজে বেড়ায়। তারা নিউ ইয়র্ক থেকে অন্যান্য রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল। কাজের সন্ধানে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কাজ সহজলভ্য হল। জীবিকার জন্য তাদের অনেকেই ফেরি করে জিনিষ বিক্রি করত। ইমিগ্রেশন আইনের তাড়নায় এ শহর থেকে ও শহর করে বেড়াত। ১৯২১ সালে আমেরিকান ইমিগ্রেশন আইন পাশ হল: যদি কোন আমেরিকান মহিলা কোন বিদেশিকে বিয়ে করে তা হলে সেই বিদেশি আমেরিকান নাগরিক বলে গন্য হবে। এই আইন পাশ হবার পর অবৈধ বাঙালীরা একটা আশার আলো দেখতে পেল। তারা চেষ্টা করল একটা বিয়ে করে বৈধ হবার। কিন্তু পাত্রি যোগার করা সোজা কথা নয়। কারন শ্বেতাঙ্গরা এই গ্রে চামড়ার মানুষকে পছন্দ করে না। বাধ্য হয়ে অবৈধরা নজর দিল কৃষ্ণাঙ্গ সোসাইটির দিকে। কৃষ্ণাঙ্গরা এই গ্রে লোকদের পছন্দ করে। সিলেটের তবারক আলী একজন কৃষ্ণাঙ্গিকে বিয়ে করে আমেরিকান নাগরিকত্ব লাভ করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আর একটি দল আসতে থাকে। পার্টিশন অব বেঙ্গল এর প্রধান কারন। কলকাতা যখন ভারতের সাথে চলে গেল তখন খালাসিরা বুঝতে পারল জাহাজে তাদের আর ভবিষ্যত নেই। তাই তারা সুযোগ বুঝে জাম্প করতে লাগল।

১৯৬০এর দশকে নতুন স্রোত শুরু হল। উচ্চশিক্ষার্থে ছাত্র, ডাক্তার এবং অন্যান্য পেশাজীবি আসতে লাগল। তাদের বেশির ভাগই ছিল

ছাত্র, ভিজিটর বা বৃত্তি নিয়ে আসা ছাত্র। যেমন কলম্বো প্ল্যান, ফোর্ড এবং রকফেলার ফাউন্ডেশন ইত্যাতি বৃত্তি।

১৯৭০এর দশকে আমেরিকায় ইমিগ্রেশনের দ্বার খুলে গেল। এই সুযোগে পেশাজীবি মানুষ আসতে লাগল। এদের বেশিরভাগই পশ্চিম বাংলার। এদের সকলেই এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। আত্মকেন্দ্রিক। পশ্চিম বাংলার বাইরের মানুষের সাথে খুব একটা যোগাযোগ রাখে না। বাংলাদেশ থেকে তখনই শুরু হল পেশাজীবির স্রোত। এখন পেশাজীবি অপেশাজীবি দলে দলে আসছে। আশির দশকটা ছিল বুমিং। যে যেদিকে সুযোগ পেয়েছে বেরিয়ে পড়েছে। ঢাকা এয়াপোর্টে একটু লক্ষ করলে দেখা যায় প্রতিটি ফ্লাইটে বাঙালি যাচ্ছে। একটা গন্তব্য নিয়ে। কোথায়ও নোঙ্গর করবে। একবার নোঙ্গর করতে পারলে আর ফিরে যাবার নাম করেনা। নিউইয়র্কে পদার্পন করেছে হাজার হাজার। এয়াপোর্টে গেলে দেখা যায় প্রতিটি ফ্লাইটে কিছু না কিছু বাঙালি আসছে। তার সাথে তাদের আত্মীয়-স্বজন। কেউ ভিজিট ভিসা, কেউ ব্যবসার ভিসা, কেউ ষ্টুডেন্ট ভিসা। এখন ১৯৯২ সাল। ১৯৯০ সাল থেকে যোগ হয়েছে লটারী। লটারীতে পরিবার নিয়ে আসছে অনেকে। এভাবে বাঙালির সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বর্তমানে নিউইয়র্কের বাঙালির সংখ্যা কত তা সঠিক ভাবে বলা যাবেনা। কারন তার কোন সঠিক তথ্য নেই। অনুমানের উপর কেউ বলে দু' লক্ষ, কেউ বলে আড়াই লক্ষ।

বর্তমানে নিউইউর্কে বসবাসরত হাজি ইব্রাহিম চৌধুরী একজন প্রবীনতম ব্যক্তি। জন্ম সিলেটে। এদেশে এসেছিলেন ১৯৩২ সালে। জাহাজে করে। একজন গায়ানীজ মহিলাকে বিয়ে করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে তিনি নব্বইর কাছাকাছি। তিনি বহু সামাজিক ক্রিয়াকর্মের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর এসব সামাজিক সেবা কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ নিউইয়র্ক সিটি হল তাঁকে বিশেষ সন্মানে ভুষিত করেন। নিউ ইয়র্কের ষ্টেটেন আইল্যান্ডে মুসলিম কবরস্থানে তাঁর জন্য জায়গা বরাদ্দ ছিল। জাতিসংঘে নিযুক্ত স্থায়ী প্রতিনিধি খাজা কায়সার ইন্তেকাল করলে চৌধুরি সাহেব ঐ জায়গা দান করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান স্বাধীনতা পূর্বকালে যতবার নিউইয়র্ক ভ্রমন করেছেন ততবার তিনি ইব্রাহিম সাহেবের আতিথ্য গ্রহন করেছেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু যখন জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদে ভাষন দিতে যান, তখন এয়ারপোর্টে নেমেই তিনি জিজ্ঞেস করেন,'চৌধুরী সাহেব বেঁচে আছেন কি?' বাঙালি মহলে তিনি একজন শ্রদ্ধভাজন ব্যক্তি। প্রবাসীর প্রতি তাঁর হাত সর্বদা প্রসারিত।

এমনি পরিবেশে, বাঙালীর স্রোত যখন বইছে, সেই স্রোতে আনিসের আগমন। প্রবাসের খাতায় যোগ হল আর একটি নাম, আরও একটি স্বপ্ন। তার পরিচিতি, একজন বাঙালী। প্রমান তার হতে পাসপোর্ট। চাওয়া মাত্রই পাসপোর্ট হাতে এসেছে। কে দিল তার হাতে পাসপোর্ট? বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান। একটা স্বাধীন দেশের স্থপতি, একটা জাতির জন্মদাতা, জাতির পিতা। হায়, দুর্ভাগা জাতি, সেই জাতির পিতাকে খুন করে তাঁরই দেয়া পাসপোর্ট হাতে নিয়ে খুনিরাও ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীময়। পৃথিবীর ঘৃন্যতম অপরাধ করেও এই খুনিরা সামান্যতম গিল্ট ফিল করছে না! মানে তাদের মনে কোন অপরাধবোধ জাগে না! না দেশে না প্রবাসে।

রাত দশটায় চাচা নামিয়ে দিয়ে গেল বাসার সামনে।

ঘরে ঢুকেই করিম চাচার দিকে তাকিয়ে রইল আনিস। এই কর্ণেল আকবর! যার দাপট ছিল অনেক, যার নাম খবরের কাগজে পড়েছে, কোন একটা ক্যু'র সাথে জড়িত বলে যাকে বিচারের নামে প্রহসনের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হত, এই সেই পালিয়ে আসা কর্ণেল আকবর! আনিস একবার কল্পনায় মিলাতে চাইল, তার পরণে খাকি পোষাক থাকলে তাকে কেমন দেখাবে। আর এখন তাকে কেমন দেখায়। তাদের গ্রামের বাড়ীর কামলা আক্কেল আলির মত দেখাচ্ছে। যেন কোন তফাত নেই। শুধু কাজের মধ্যে একটু তফাত। আক্কেল আলী ক্ষেতে কাজ করে, আর আকবর চাচা এখানে কনষ্ট্রাকশনের কাজ করে।

করিমের কথায় চমকে উঠল আনিস।

কি ভাতিজা, এভাবে তাকিয়ে আছ কেন আমার দিকে? তোমার চাচী কি তোমার কাজ রেডি করে ফেলেছে?

না, আমি ভাবছি আপনার কথা।

আমার কথা? আমার জন্য তোমার আবার ভাবনার কি হল?

আপনি কর্ণেল ছিলেন বাংলাদেশে? আপনি কর্ণেল আকবর?

ও, এই কথা! তোমার চাচা বুঝি সব ফাঁস করে দিয়েছে? এটা এমন ভাববার কি হল? এমন অনেক বড় বড় আর্মি অফিসার এখানে আছে। আমার চেয়েও খারাপ কাজ করে। আর্মি থেকে বের হয়ে গেলে আমাদের দাম থাকেনা। কারণ আমরা নিজেদের জীবন চালনার জন্য এমন কিছুই শিখিনা। তবে হ্যা, বাংলাদেশের রিটায়ার্ড আর্মিরা খুব আরামে আছে। খোঁজ নিয়ে দেখ, সবাই ব্যবসা করে। দু নম্বরী। কাজের কিছুই জানেনা, কিন্তু ব্যবসাটা তার চাই। এবং সবচেয়ে বেশি লাভ করা চাই। অনেক সময় ইচ্ছেমত। বাংলাদেশে এখন অলিখিত একটা আইন আছে। সেটা হল কোন আর্মি যদি কোন ব্যবসা করতে চায় তাহলে তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এমনি করে প্রায় সব ব্যবসাই এখন আর্মির হাতে। হাতে গোনা কয়েকজন শুধু এটা করতে পারেনি বা সুযোগ পায়নি। আমার কথা আলাদা। বিচারের প্রহসন থেকে বাঁচতে হলে দেশের বাইরে আমাকে থাকতেই হবে যতদিন পর্যন্ত না ফিরে যাবার পরিবেশ হয়। তাই যা পাই তাই করি। বর্তমানে যা করছি তা আমার কাছে ভাল না লাগলেও করতে হচ্ছে। তাছাড়া এর চেয়ে ভাল কাজ তো পাবনা।

এসব অনেক বড় কাহিনী। আমার মামলা এখনও ঝুলছে। তাই দেশে ফেরা আমার হবেনা। যখন সময় আসবে তখনই দেশে ফিরব। এখন তোমার কথা বল। তোমার চাচী কি বলল? তোমাকে একটা ভাল চাকরি জোগাড় করে দেবে তো?

চাকরির কথা কিছু হয়নি। কয়দিন ঘুরে বেড়াতে বলেছে।

আলম বলল, দেখ তোমার কি মজা! কতবড় সুযোগ তোমার। ঘুরে বেড়াতে পারবে। আর আমরা? এসেই যদি কাজ শুরু না করতাম তাহলে ঘরবাড়ী চলে যেত। বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে তবে এসেছিলাম। সব শোধ করে দিয়েছি। এখানে ছুটি নিলে বেতন নেই। কাজেই ছুটি পারতপক্ষে নেইনা। এই কয় বছরে হাতে গোনা কয়েকদিন নিয়েছি। ঠিক ইচ্ছে করে নেইনি। কাজ বন্ধ ছিল বলে। একদিন ঘুরে বেড়াবার চিন্তাই করতে পারিনা। আর কি পরিশ্রমের কাজ! দেশেই ভাল ছিলাম। এর থেকে এনে ওকে, ওর থেকে এনে একে, এভাবেই চলছিলাম। আদম বেপারি না করলে তো বিদেশেও আসতে হত না, এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনিও

খাটতে হতনা। লেখাপড়া না করলেও আমার বুদ্ধির অভাব ছিলনা। পরের পয়সা দিয়েই খুব ডাটে চলতাম।

কি করতেন আপনি বাংলাদেশে?

কিছুই করতাম না। কোর্টের সামনে ঘুরাঘুরি করতাম। ঝোঁপ বুঝে কোপ মারতাম। মামলা জিতিয়ে দেব বলে টাকা নিতাম। বলতাম জজ ম্যাজিস্ট্রেট আমার লোক। মাঝে মাঝে এমনিতেই দুএকটা কেইস জিতে যেত, আর আমার কাছে লাইন পড়ে যেত। বেশ কিছু টাকা আমার হাতে এসে গেল। তখন এক আদম বেপারির সাথে পরিচয়। বড়লোক হবার লোভে তার সাথে যোগ দিলাম। অনেক মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যখন বিদেশে পাঠানোর কোন ব্যবস্থা হয়নি তখন নিজে বিদেশে আসার ব্যবস্থা করলাম। সেই থেকে আমি নিজে বিদেশে আছি। এখন নিজের রক্তপানি করা কামাই দেশে পাঠালেও মানুষ মনে করে সেগুলো মানুষের টাকা। মানুষ গালাগালি করে। অথচ এখানে কি করি তা যদি স্বচক্ষে কেউ দেখত!

আপনারা বললেন সাবওয়েতে মাগিং হয়। সাবওয়েতে যান কেন। দুজনে একটা গাড়ী কিনে নিলেই পারেন।

কি বললে? গাড়ী? করিম একবারে চেচিয়ে উঠল। গাড়ী কেনা তো সহজ, কিন্তু রাখা কঠিন। গাড়ী নিয়ে তো কাজে যেতে পারবেনা। পার্কিং পাবেনা। ভুল পার্কিং করলে ৫৫ ডলার টিকেট খাবে। পার্কিংএ রাখলে বেতন যা পাবে তা দিয়ে পার্কিংএর ভাড়া হবেনা। এমন সব জায়গা আছে যেখানে পার্ক করলে টিকেট দেবে, তারপর টো করে নিয়ে যাবে। যদি টো করে নিয়ে যায় তাহলে গাড়ী নিয়ে ঘরে আসতে কমপক্ষে ৫০০ ডলার চলে যাবে।

আলম যোগ করল, আব্বাস মিয়া গাড়ী কিনেছিল। তার বাড়ীর সামনে পার্ক করতে গিয়ে সপ্তাহে দু একটা টিকেট খেত। এসব রাস্তায় অলটারনেট পার্কিং মানে আজকে রাস্তার এপাশে তো কাল রাস্তার ওপাশে পার্ক করতে হয়। আব্বাসের কাছে একটা প্যাঁচ লেগে যায়। কোনদিকে রাখলে যে টিকেট দেবেনা তা তার খেয়ালে থাকতনা। তাছাড়া পার্কিংও পাওয়া যায়না। ঘুরতে ঘুরতে অসহ্য হয়ে এক জায়গায় পার্ক করত, আর টিকেট খেত। একদিন সকালে দেখে তার গাড়ী নেই। পুলিশে খবর দিলে পুলিশ বলল, ওরাই নিয়ে গেছে।

কি বললেন? পুলিশে নিয়ে গেছে?

হ্যা, পুলিশে নিয়ে গেছে। কারন সে টিকেটের টাকা পরিশোধ করেনি। জানতও না। যখন আনতে গেল তখন দেখে যে-টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে আনতে হবে সে টাকা দিয়ে ওরকম দুটো গাড়ী কেনা যায়। তাই ওটা আর আনেনি।

তাছাড়া গাড়ীর মেইন্টেনেন্সও অনেক। ওসব ঝামেলায় কে যায়? সাবওয়েই সবচেয়ে ভাল। যখন যেখানে ইচ্ছে যাও। সময় কম লাগে। সাবওয়েতে গেলে যেখানে লাগবে দশ মিনিট, গাড়ীতে লাগবে আধা ঘন্টা বা তারও বেশি। গাড়ী আমাদের মত লোকের জন্য নয়।

আনিসের সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তার কল্পনার সাথে কোন কিছুই মিলছেনা। যখন তখন ঘর থেকে বের হওয়া যাবেনা, গাড়ী কেনা যাবেনা, চাচার অফিস নেই, কাজ খুঁজতে হবে অন্য কোথাও। তারপর করিমের দিকে তাকিয়ে বলল, কাল আমি যাব আপনাদের সাথে। সকালে আপনারা যখন উঠেন, আমাকে ডেকে দেবেন। দেখব আপনারা কি কাজ করেন। তার সাথে পথঘাটও কিছু চেনা হয়ে যাবে।

তাহলে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়। সকাল পাঁচটায় উঠতে হবে।

- ৬ -

সকাল পাঁচটায় আলম করিমকে ডেকে উঠাল। বলল, আমি বাথরুম সেরে এসেছি, এবার তুমি যাও। তুমি আসলে আনিসকে ডাকব। আনিসকে আর ডাকতে হলনা। করিম বাথরুমে যাবার পরই আনিস উঠে বসল। তারা তাদের কাজের পোষাক পরে প্রস্তুত হল।

আনিসের মনে আজ একটা বিশেষ উৎসাহ। সে সাবওয়ে দেখবে। অনেক দিনের কল্পনা আজ বাস্তবে রূপ নেবে। করিমদের সাথে রওয়ানা দিয়ে তিনটা রাস্তা পরেই রাস্তার উপর একটা ফটক দিয়ে নীচে নামতে লাগল। আলম বলল, এই সাবওয়ে। আগে তো কখনও দেখনি। এবার দেখে নাও। যতদিন এদেশে থাকবে সাবওয়ে ছাড়তে পারবেনা। সবচেয়ে বড় সম্বল।

আনিসের কাছে মনে হল যেন দোতলা থেকে নীচে নামছে। নেমেই সামনে একটা প্রবেশ করার জন্য তিনটে রড দিয়ে চরকির মত ফটক। আধুলির মত পেতলের একটা পয়সা যাকে টোকেন বলে, আনিসের হাতে দিয়ে করিম বলল, এটা এই ছিদ্রে দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে যাও। আনিস সেভাবেই কাজ করল। ধাক্কা দিতেই চরকি ঘুরে গেল। আনিস ভেতরে চলে গেল। আনিস করিমকে জিজ্ঞেস করল, আধুলি দিলে চলবে না?

না, অন্য কোন কিছু চলবে না। এই টোকেন বিশেষ ভাবে তৈরি শুধু সাবওয়ে এবং বাসের জন্য। বাসেও এই টোকেন চলে।

ভেতরে ঢুকে আনিস থ হয়ে গেল। মাটির নীচে বহুদূর খোলা। এ যেন কমলাপুর রেল স্টেশন। কমলাপুরে শেডটা বেশ উচুঁ, আর এখানে শেডটা একটা ঘরের সমান উচু। অনেকগুলো রেল লাইন। যেন জংশন। প্লাটফরম বহু চওড়া এবং অনেক লম্বা যা কমলাপুর রেল স্টেশনের চেয়ে কম নয়। তার মনে হল এটাই হয়ত সবচেয়ে বড় স্টেশন। করিমকে জিজ্ঞেস করল, এটাই কি সবচেয়ে বড় স্টেশন?

না, এটা ছোট স্টেশন। প্রায় সবগুলোই এর চেয়ে বড়। কিছু আছে এমন বড়, যা তুমি কল্পনা করতে পারবেনা। আস্তে আস্তে সবই দেখবে।

আনিস দেখল উল্টোদিক দিয়ে একটা ট্রেন এসে চলে গেল। দু মিনিট না দাঁড়াতেই তাদের ট্রেন এসে গেল। ট্রেন যখন প্লাটফরমে এসে দাঁড়াল, আনিস তাকিয়ে দেখল ট্রেন থেকে প্লাটফরমের দূরত্ব আধা ইঞ্চি মাত্র এবং গাড়ীর দরজা প্লাটফরমের সমান। উঠা নামার সময় কোন দুর্ঘটনা হবার সম্ভাবনা নেই। যারা নামার তারা নামার পর সবাই উঠল। কোন মারামারি ধাক্কাধাক্কি নেই। যারা বসার জায়গা পায়নি তারা হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এক মিনিটেই গাড়ী ছেড়ে দিল। তিন চার মিনিট পর পর স্টেশনে থামে। প্রতিটা স্টেশনই আনিসের কাছে মনে হয় একটার চেয়ে আর একটা বড়। পনের মিনিট পর তারা বেরিয়ে আসল সাবওয়ে থেকে। কয়েকটা রাস্তা পেরিয়ে কনস্ট্রাকশন কোম্পানীতে এসে হাজির হল।

একটা তিনতলা বাড়ীর সামনে কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর সাইন লেখা চাচার ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। করিম বলল, এখানেই আজ আমাদের কাজ।

আনিস তাকিয়ে দেখল ভ্যানের পাশে কয়েকটা বালতি, একটা মোটা দড়ি এবং আরও ছোটখাটো জিনিসপত্র। ভ্যানের উপর একটা বড় মই। আনিস জিজ্ঞেস করল, এখানে কি কাজ করবেন?

এই দালানের প্লাস্টার করতে হবে। আর ভেতরে রং হবে। করিম বলল।

চাচা কোথায়?

ভেতরে আছে বোধ হয়। তিনি রংএর কাজটাই বেশি করেন। কারণ হেভী কাজ এখন আর পারেন না।

ভ্যান থেকে নেমেই আলম সিমেন্ট বালু মিশাতে লাগল একটা শাবল দিয়ে। করিম ভেতরে গিয়ে ছাদে উঠে আলমকে বলল দড়িটা ঢিল দিয়ে তার হাতে দিতে। দড়ির একদিকে বড়শির মত মোটা লোহার রড লাগানো। দেখা গেল দড়ি একটা নয়, দুটো। বরশি দুটো দালানের ছাদের কার্নিশে লাগিয়ে দু মাথা নীচে নামিয়ে দিল, আলম মইটা দুদিকে বেঁধে উপরে টেনে তুললো। আনিস জিজ্ঞেস করল, মই দিয়ে কি করবেন?

এটা মই নয়, স্কেফল। এটার উপর দাঁড়িয়ে কাজ করবে।

কতক্ষণের মধ্যেই কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু হয়ে গেল। করিম প্লাস্টার করছে, আলম বালতি ভরে সিমেন্ট দড়ি দিয়ে উপরে টেনে তুলে দিচ্ছে। আনিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে আর ভাবছে এই তার কল্পনার কনস্ট্রাকশন কোম্পানী! দশটা বছর এই কোম্পানীর ম্যানেজার হবার এত শখ ছিল! এমন সময় সারেং চাচা বেরিয়ে আসল। আনিসকে দেখেই হাসিমুখে বলল, তুমি এসেছ? দেখ আমাদের কেমন কাজ? কত পরিশ্রমের! আমাদের মত লোকের কাচা পয়সা বানাতে হলে এ ধরনের কাজই উপযুক্ত কাজ। এই ধর করিম, অন্য কোথায়ও কাজ করলে দৈনিক তিরিশ ডলারের বেশি পাবেনা। আর আমি দিচ্ছি একশ ডলার রোজ। আলম পাচ্ছে ৬০ ডলার। তাদেরকে এত টাকা দিয়ে, জিনিষ পত্রের দাম বাদ দিয়েও আমার লাভ হবে ছয় হাজার ডলারের মত। কাজটা শেষ করতে লাগবে দু সপ্তাহ। বুঝে কাজ যোগাড় করতে পারলে এর চেয়ে ভাল ব্যবসা আর নেই। যখন কাজ থাকেনা তখনই লোকশান। তারপর একটা রংএর বালতি হাতে নিতে গেলেন। আনিস এগিয়ে গেল। আমি দিয়ে আসি চলুন। চাচার সাথে বালতি নিয়ে ভেতরে গেল। চাচা বালতির মুখ খুলে রং করতে লাগল।

আনিস দাঁড়িয়ে দেখল। একদম সোজা কাজ। একটা ফোম জাতীয় রোলে একদিকে হাতল লাগানো, রং লাগিয়ে দেয়ালে টান দিলে ওটা ঘুরতে থাকে এবং নিখুতভাবে রং হয়। আনিসের মনে হল এ কাজটা তার নিজের। এই কাজ করেই চাচা টাকা বানিয়েছে, তার সমস্ত খরচ বহন করেছে এবং করছে। চাচার হাত থেকে জোর করে রোলারটা নিয়ে নিজে শুরু করে দিল। চাচাকে বলল, আপনি বিশ্রাম করুন গিয়ে।

সন্ধ্যায় কাজশেষে ওরা যখন ঘরে ফিরল তখন আনিসকে চেনাই যায়না। বাংলাদেশ থেকে তৈরি এত সখের প্যান্ট সার্ট রং লেগে একবারে কাজের পোশাক হয়ে গেছে। করিম বলল, ভাতিজা তাহলে একদিনেই ওস্তাদ হয়ে গেল? মনে হয় যেন বহুদিন থেকে এ কাজে অভ্যস্ত!

এসব কাজতো শেখার তেমন কিছু নেই, একবার দেখলেই হয়। আনিস বলল।

ছয়টার দিকে চাচার ভ্যান এসে থামল আনিসের বাসার সামনে। ভ্যান থামতেই আনিস আগে নামল। করিম আর আলম নামছে। আনিস কয়েক এগিয়ে গেল দরজার দিকে। হঠাৎ উপর থেকে একটা বোতল রাস্তার উপর পরে খান খান হয়ে গেল। আনিস আর এক হাত এগিয়ে

গেলেই তার মাথায় পড়ত। করিম চিৎকার করে বলল, ভাতিজা! তাড়াতাড়ি গেইটের ভেতরে চলে যাও! আরও পড়তে পারে!

বলার সাথে সাথেই আনিস গেইটের ভেতর চলে গেল। কিছুই বুঝতে পারছে না। একটু পরে আলম আর করিম ভেতরে গেল। বলল, এরকম মাঝে মাঝে হয়। মাত্রা বেশি হয়ে গেলে হুশ থাকেনা। বোতল খালি হলে নীচে ফেলে দেয়। কার উপর পড়ল সেটা তাদের খেয়াল থাকে না। দেখনা বিল্ডিংএর সামনের রাস্তা দিয়ে কোন মানুষ পারতপক্ষে হাটে না। এই ইমারতের যথেষ্ট নাম আছে। তোমাকেও সাবধান হতে হবে। ঢোকার আগে ভাল করে খেয়াল করে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়তে হবে।

আনিস ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

পরের দিন করিম এবং আলম প্রস্তুত হয়ে আনিসকে ডাকল। বিছানা থেকে উঠার কোন লক্ষন নেই তার। কয়েকবার ডাকাডাকির পর বলল, আমার শরীরটা ভাল বোধ হচ্ছে না। কাল থেকে প্রশ্রাব লাল হচ্ছে। আজ ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। কোথায় ডাক্তার, কিভাবে যাব একটু বলে দিন।

ডাক্তার! ডাক্তারের কাছে যাবা? আলম জিজ্ঞেস করল। একদম গলা কাটবে! ওদের ফি কত জান? তারপর ঔষধ। এসব প্রাইভেট ডাক্তারের কাছে গেলে আর ছুটতে পারবেনা। শুধু তারিখ দেবে। তারিখ মত তোমার যেতেই হবে। না গেলে এমন সব কথা বলবে যে তুমি আর বেশি দিন টিকবেনা। একটা ভেলকি খেলার মত। ওরা জাদু জানে। তোমাকে শুধুই প্রশ্ন করবে, তুমি করতে পারবেনা।

করিম বলল, প্রত্যেকটা প্রাইভেট ডাক্তারের অফিসে গিয়ে দেখবে ওয়েটিং রুম একটা, ভেতরে রোগীর কামরা কম করেও তিনটা। পূর্ব এপয়েন্টমেন্ট ছাড়া যেতে পারবেনা। এপয়েন্টমেন্ট করে তোমার নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই যখন পৌঁছবে, তখন দেখবে বাংলাদেশের সরকারী হাসপাতালের মত লাইন। ধর, তোমাকে সময় দিয়েছে ২টায়, তার আগেই গিয়ে বসে আছ। কিন্তু তোমার ডাক পরবে কম করে হলেও এক ঘন্টা পর। ডাক পরলেই তুমি মনে করবেনা যে তোমার রোগ নির্ণয়ের জন্য কাজ শুরু হয়ে যাবে। তোমাকে ডেকে নিয়ে ভেতরে একটা কামরায় বসতে বলে ডাক্তার চলে যাবে অন্য কামরায়। তোমার মত অন্য কামরায়ও রুগী বসে আছে। সেসব রুগী দেখে তারপর তোমার কাছে আসবে।

তুমি যে এই তিন ঘন্টা ডাক্তারের সাথে কথা বলার জন্য বসে রইলে কথা কিন্তু বলতেই পারবেনা। সে সুযোগই পাবেনা। ডাক্তারের সময়ের দাম আছে, প্রতি মিনিটে ডলার প্রসব করে। তোমার সময়ের দাম নেই। এসেই তোমাকে কিছু না জিজ্ঞেস করেই তার কাজ শুরু করে দেবে। সেই মান্দাতার আমলের নাড়ী দেখা, স্টেথো দিয়ে পিঠ দেখা, চোখ দেখা, জিহ্বা বের করা। তুমি কিছু বলার আগেই ডাক্তার তার ডাক্তারী শেষ করে ফেলেছে। সিরিয়াস না হলে ঔষধ দেবেনা। রক্ত, প্রশ্রাব, পায়খানা ইত্যাদি পরীক্ষা করার জন্য লিখে দেবে। এসব রিপোর্ট এলে তারপর আর একটা তারিখ মত যাবে, ঔষধ দেবে, আবার তারিখ দেবে। এমনি খেলতে থাকবে। কারও ভিজিট ৬০ ডলার, কারও ১৬০ আবার কারও ২৬০। যদি ২৬০ ডলারের ডাক্তারের হাতে পড় তাহলে হাজার ডলার নিয়ে টান পড়বে প্রথম ভিজিটেই। তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর। কনি আইল্যান্ড হসপিটালে চলে যাও। বিল যাই ই করুক, পয়সা দেয়া লাগবেনা। সময় আর একটু বেশি লাগতে পারে।

ওখানে কি ফ্রি চিকিৎসা হয়?

না ফ্রি না। এখানকার নিয়ম হল যে কেউ হসপিটালে গেলে আগে তার চিকিৎসা করতে হবে। টাকার কথা পরে। তারা পরে বিল পাঠিয়ে দেবে। তখন লিখে দিলেই হবে যে আমার কোন কাজ নেই। তারপর এক সময় মাফ করে দেবে। এদেশে এই সবচেয়ে বড় সুবিধা। যাও, হাসপাতালেই চলে যাও। তারপর কিভাবে কোন গেইটে গিয়ে নাম লেখাতে হবে সব বলে দিল আনিসকে।

-৭-

আনিস যখন কনি আইল্যান্ড হসপিটালের ইর্মাজেন্সী বিভাগে গিয়ে পৌছল তখন সকাল নয়টা। লাইন দেখেই বুঝে নিয়েছে এরা তারই মত রোগি। লাইনে দাঁড়িয়ে চারদিকটা একবার দেখে নিল। বিরাট হলঘর। প্রায় শতখানেক মানুষ বসে আছে। কেউ ঝিমুচ্ছে, কেউ কাতরাচ্ছে। লাইনের সব শেষে দাঁড়িয়ে লাইনের প্রথম খুঁজে বের করল। কাউন্টারে একজন মহিলা বসে একজন একজন করে ডাকছে আর নাম ধাম লিখছে। লাইনটা ঘুরে ঘুরে একটা ইংরেজি ‘এস’ হরফের মত হয়ে আছে। ‘এস’এর শেষ মাথায় দাড়ানোতে আনিস কাউন্টারের প্রায় কাছাকাছি দাঁড়াল। কাউন্টারে মহিলাকে স্পস্ট দেখা যাচ্ছে। চ্যা[illegible] া নাকমুখ দেখে সে ধরে নিয়েছে চাইনীজ ধরণের কোন দেশের হবে। কিন্তু যে হারে সে রুগি ডাকছে তাতে আনিসের পালা আসতে কম করে হলেও দু ঘন্টা লাগবে।

এমন সময় দুজন লোক ধরাধরি করে এক রুগি নিয়ে এল। তার গায়ের কাপড় রক্তে লাল হয়ে আছে। মাথাটা ঝুলে আছে নীচের দিকে, আর রক্ত টপ টপ করে পড়ছে। বেঁচে আছে কি মরে গেছে বুঝা যায়না। যারা এনেছে তাদের গায়েও রক্তের দাগ লেগে আছে। ওরা এসে কাউন্টারে যায়নি। সোজা ভেতরে চলে গেল। মনে হল ওরা জানে এধরনের মৃত্যুপথযাত্রী রুগি কোথায় নিতে হয়। তাদের নাম লেখাবার প্রয়োজন হয়নি। হয়ত বা উপরওয়ালার খাতায় লেখা হয়ে গেছে। এখন শুধু পরীক্ষা করবে, কেন মরল, কিভাবে মরল, কখন মরল। এসব নিয়ে কয়েকদিন সময় কাটাবে। তারপর রিপোর্ট দেবে। তাতে করে যে মরল তার কোন ফায়দা হবেনা।

যারা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছে তাদের ডাক পরে ডাক্তারের কাছে। যে ডাক্তারের কাছে যাবে সে ডাক্তার নিজে এসে নাম ধরে ডেকে নিয়ে যায় ভেতরে। আনিস লক্ষ করল দু একজন ডাক্তার বাংগালি চেহারার। ঠিক বুঝতে পারল না বাংলাদেশী না ইন্ডিয়ান নাকি পাকিস্তানী। কিন্তু তার মনটা খুশি হয়ে উঠল। যাক তাহলে এখানেও আমাদের এশিয়ান ডাক্তার আছে। এবং আমেরিকানদের চিকিৎসা করছে।

আকাশ কাপিয়ে সাইরেন বাজিয়ে একটা এ্যাম্বুলেন্স এসে থামল গেইটে। একটু পরেই দুজন লোক স্ট্রেচারে করে রুগি নিয়ে ভেতরে চলে গেল। তারা যেন দৌড়োচ্ছে রুগি নিয়ে। সময় নেই। এই বুঝি শেষ হয়ে গেল। সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। কিছুই দেখা যাচ্ছেনা। শুধু মুখে অক্সিজেনের নলটা দেখা যাচ্ছে। কি রোগ নিয়ে এসেছে কে জানে! হয়ত বা আর ফেরৎ যাবেনা। হয়ত বা ভাল হয়ে ফিরে যাবে আপনজনের কাছে। এমন সময় আনিসের লাইন এসে গেল। যখন আনিস কাউন্টারে পৌঁছল তখন এক ইন্ডিয়ান ডাক্তার একজন রুগিকে ডেকে নিয়ে গেল ভেতরে। আনিস তার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কাউন্টারে মহিলা জিজ্ঞেস করল তোমার কি অসুখ। বাংলাদেশী স্টাইলে

অন্যমনস্কভাবে বলল, প্রশ্রাব লাল হয়, তাই পরীক্ষা করাতে এসেছি। মহিলা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

আবার জিজ্ঞেস করল, ইউরিন রেড?

ইয়েস, রেড।

তারপর নাম ধাম বয়স ইত্যাদি লিখে বলল, ও কে, ওখানে বসে অপেক্ষা কর। ডাক্তার এসে ডাকবে।

যেমন রোগি ডাক্তারের সংখ্যাও কম নয়। তাই প্রায় দু ঘন্টা পরেই আনিসের ডাক পড়ল। মিঃ রেমান (রহমান)। আনিস তাকিয়ে দেখে এক সাদা চামড়ার ডাক্তার। সে আশা করেছিল কোন এশিয়ান ডাক্তার। কিন্ত তা হলনা। সে উঠে দাড়াল। ডাক্তার সাথে করে নিয়ে গেল ভেতরে।

প্রথমেই আনিসের হাতে একটা সাদা কাপড় দিয়ে বলল, তোমার কাপড় ছেড়ে এটা পরে এস। পর্দা দেয়া একটা জায়গা দেখিয়ে দিল। আনিস কাপড় বদল করতে গিয়ে দেখে এক খন্ড সাদা কাপড়। শুধু সামনে দিয়ে বুক থেকে হাটু পর্যন্ত ঢাকা যায়। পেছনে বাধার জন্য পেট বরাবর একটা ফিতে। একটু অন্যমনস্ক হলেই গোপনাঙ্গ বেরিয়ে পড়ার সম্ভাবনা শতকরা নব্বই ভাগ। সেটা পরে সে যখন ফিরে এল ডাক্তার একটা বেড দেখিয়ে বলল, শুয়ে পড়।

উপায় নেই। শুয়ে পড়ার সাথে সাথে ডাক্তার আনিসের এক হাতে একটা বেল্ট বেধে দিল। ওতে একটা নাম্বার লেখা। যেন কুকুরের গলায় তার প্রভুর দেয়া চিহ্ন। পালিত কুকুর। যেখানেই যাক প্রভুর কাছে ফিরে আসবে। আর একটা হাত টেনে নিয়ে স্যালাইনের সুই ঢুকিয়ে টেপ দিয়ে শক্ত করে আটকে দিল। যাতে খুলে পালিয়ে যেতে না পারে। আনিস উপরে তাকিয়ে দেখে অনেক বড় এক সেলাইনের বোতল বেড স্ট্যান্ডে আটকানো। আনিস ভেবে পেলনা প্রশ্রাবের সাথে স্যালাইনের কি সম্পর্ক। ডাক্তারী ব্যাপার। বোঝা মুস্কিল। তারপরই তার মনে পড়ল অপারেশন করে তোয়ালে পেটের ভেতর রাখার কাহিনী পড়েছে। এই নিউইয়র্কেই নাকি বাম পায়ের বদলে ডান পা কেটে ফেলেছে। এমন একটা কিছু করছেনা তো এখানে? তার সন্দেহ হল। স্থির করল ডাক্তারকে বলবে যে সে শুধু প্রশ্রাব পরিক্ষা করাতে এসেছে। আর কিছু নয়। আজ না হলে আর একদিন আসবে। এমন জরুরী কিছু নয়। মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে ডাক্তার আশে পাশে নেই।

কথাগুলো বলার জন্য আনিস অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু ডাক্তার আর এলনা। এল একজন মহিলা। এসেই কোন কথা না বলে তাকে সহ তার বেডটা টেনে নিয়ে চলল অজানা উদ্দেশ্যে। আনিস মনে করল এ আর এক ডাক্তার। জিজ্ঞেস করল, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

তোমার এক্সরে হবে। ডার্করুমে নিয়ে যাচ্ছি।

আমার কি হয়েছে? এতসব করছ কেন? আমার এমন কোন রোগ নেই যার জন্য এতসব পরীক্ষা করতে হবে।

আমি নার্স। যা বলবার ডাক্তারকে বলো। আমাকে যা করতে বলা হয়েছে তাই করছি।

আনিস অসহায়। হাত বাধা অবস্থায় শুয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। একটা বড় দরজার সামনে এসে নার্স তার বেডটাকে এমন জোরে ভেতরে ঠেলে দিল যেন একটা মৃত দেহ মর্গে রেখে গেল। ধাক্কা দিয়ে ভেতরে রেখেই সে চলে গেল।

ভেতরে এমন ঠান্ডা যে কয়েক সেকেন্ডেই আনিসের কাঁপুনী ধরে গেল। গায়ের যে পাতলা কাপড়টা হাটুর উপর থেকে বুক পর্যন্ত ঢাকা।

পিঠের নীচে অনেকটা সরে গিয়ে খালি হয়ে আছে। তার মনে হল এখনই সে একবারে ফ্রোজেন হয়ে যাবে, এক সময় সত্যি মরে যাবে, তারপর সত্যি সত্যি মর্গে রেখে আসবে। এ অবস্থায় কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে! এর মাঝে আর একটা মৃতদেহ কিনা বুঝা গেলনা, তার বেডে এসে ধাক্কা দিল। তার বেডটা আরও ভেতরে চলে গেল। একটু পরে বুঝল, সেটা মৃতদেহ নয়। কারণ কাতরাচ্ছে আর বিড় বিড় করে কি যেন বলছে। হাত পা তারই মত বাঁধা। বিছানার সাথে লেপ্‌টে লেগে আছে।

কিছুক্ষনের মধ্যেই একজন আফ্রিকান-আমেরিকান এসে বেডটা টেনে নিয়ে গেল আর এক কামরায়। বোধ হয় তারা জানে এ অবস্থায় বেশিক্ষন থাকলে মর্গে পাঠাতে হয়। তাই কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক্সরে হয়ে গেল। কয়েকবার শুধু বলল, শ্বাস বন্ধ কর, শ্বাস নাও। তারপর আর এক দরজা দিয়ে বাইরে ঠেলে দিল।

বরফের ঘর থেকে তো বাইরে এল, এবার কোন দিকে নিয়ে যাবে কে জানে! এমন সময় বাঙালি চেহারার মত এক ডাক্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে দেখে আনিস ডাক দিল, এক্সকিউজ মি, আর ইউ বাংলাদেশী অর ইন্ডিয়ান?

ডাক্তার যেন কিছুই শুনেনি, যেমনি যাচ্ছিল, তেমনি চলে গেল। ডাক্তারের মেজাজ দেখে আনিস বুঝে নিল নিশ্চয়ই বাংগালি অথবা ইন্ডিয়ান। অন্যদেশের ডাক্তারের এমন মেজাজ হয়না, এমন দাম্ভিকতাও নেই। ডাক্তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে সে যখন এমনি ভাবছিল, তখন আর এক নার্স এল। একটা রবারের বেল্ট হাতে বেধে বলল, মুঠি করে ধরে রাখ কতক্ষন। আনিস তাই করল। ছোট দু' শিশি রক্ত নিয়ে বলল, মুঠি ছেড়ে দাও। রক্ত নিয়ে সে চলে গেল।

আনিস বুঝে পেলনা প্রশ্রাবের সাথে এই এক্সরে আর রক্তের কি সম্পর্ক। তখন আর এক জন এসে টেনে নিয়ে গেল একটা কামরায়। সেখানে তার মত আরও তিনজন। সকলেরই হাত বাঁধা, বিছানার স্ট্যান্ডে স্যালাইনের বোতল টাঙ্গানো হাতে সুঁই গাঁথা। তার নিজের স্যালাইনের বোতলের দিকে তাকাল আনিস। তাকিয়ে আৎকে উঠল। একি! ২০০ সি সি র কম হবেনা! আর যে অনুপাতে ধীরে ধীরে ড্রপ হচ্ছে তিন দিনেও শেষ হবে বলে মনে হয়না। তাহলে সত্যিই রোগী হয়ে গেলাম! স্যালাইনের সাথে প্রশ্রাবের কি সম্পর্ক! প্রশ্রাব তো নিলনা! তার ইচ্ছে হল সব খুলে ফেলে চলে যায়। কিন্তু হাতের সুইটা এমনভাবে বাধা যে এক হাত দিয়ে খোলা যাবেনা।

নার্স আনিসকে বেঁধে ছেদে ঠিক ঠাক করে চলে গেল। বলে গেল ডাক্তার আসবে এক ঘন্টা পর, তার কাছে বলার জন্য যদি কিছু বলার থাকে।

এক ঘন্টা কত সময়! কবে শেষ হবে! সেলাইন যেমন ধীরে পড়ছে, তার চেয়েও ধীরে চলছে সময়। কখন আসবে ডাক্তার! তার কাছে বলবে তাকে ছেড়ে দেবার জন্য। তার কোন অসুখ নেই। বরং এখানে এ অবস্থায় থাকলেই সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। এমন সময় তার পায়ের দিক থেকে ফিস ফিস আওয়াজে তাকিয়ে দেখে একটি আঠার উনিশ বছরের ছেলে সে বেডে শুয়ে থাকা এক অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতীকে চুমো খাচ্ছে। যুবতীর হাত দুটি যুবকের গলা জড়িয়ে আছে। আনিস মির মির করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষন। মনে হল ছেলেটা মেয়েটার সমস্ত রোগ চুষে নিতে চায়। কি জানি কি রোগ। এ রোগের ঔষধ হয়ত বা চুমো। কোন

কোন রোগ হয়তবা চুমোতে সেরে যায়। মেয়েটা এমনভাবে জড়িয়ে ধরে আছে ছেলেটা সোজা হতে পারছেনা। কিন্তু মুখও উঠাচ্ছেনা।

তার উল্টোদিকের বিছানায় এক বৃদ্ধ। তার শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সাথে বুকটা উঠা নামা করছে, দূর থেকেও আওয়াজ শোনা যায়। তার পাশে যে এত চুমোচুমি হচ্ছে সেদিকে তার কোন খেয়াল নেই। একবার তাকিয়েও দেখছেনা। তাকানোর অবস্থাও নেই তার। তার কাছে এসবের কোন দাম নেই।

আনিসের পাশের বিছানায় যে লোকটি তার একটা পা উপর দিকে বাঁধা। সাদা ব্যান্ডেজ করা। স্যালাইনটা দ্রুত গতিতে চলছে। মনে হয় এক ঘন্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। লোকটা কোন নড়াচড়া করছেনা। সেও কি শেষ হয়ে যাবে এক ঘন্টার মধ্যে? আনিস ভাবল তার নিজেরটা খুব ধীরে চলছে। যদি স্যালাইনের সাথে ছুটির সম্পর্ক থেকে থাকে তাহলে তিন দিনের আগে সে ছাড়া পাচ্ছে না। এ স্যালাইন তিনদিনের আগে শেষ হবে না। আসুক ডাক্তার। তাকে বুঝিয়ে বলবে।

অনেক প্রতিক্ষার পর ডাক্তার এল দু ঘন্টা পর। তখন বাজে বিকেল ছয়টা। সাদা চামড়ার ডাক্তার। তার ভাগে যে কেন এই সাদা চামড়ার ডাক্তার পড়ে! তার পাশের রুগীটাকে আগে দেখল। সাথে একজন নার্স। মাথার কাছে লিষ্টটা হাতে নিয়ে নার্সকে কি বলল। নার্স রুগীর পা'টা আরও একটু উপরে উঠিয়ে দিল। আনিস উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে। ডাক্তার তার কাছে আসার সাথে সাথেই সে বলল, দেখ আমার কোন অসুখ নেই। শুধু প্রস্রাব পরীক্ষা করাতে এসেছিলাম। আমার কোন অসুবিধা নেই। আমাকে চলে যেতে দাও দয়া করে। ডাক্তার তার কোন কথারই জবাব দেয়নি। যেন কিছুই শুনছেনা। বেডে লটকানো চার্টটা হাতে নিয়ে দেখল। আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারবনা। যে ডাক্তার ভর্তি করেছে সে আসলে তাকে বলবে। একমাত্র সেই তোমাকে রিলিজ দিতে পারবে। তাছাড়া তোমার প্রস্রাবে প্রবলেম আছে।

আমাকে যে ডাক্তার ভর্তি করেছে সে কোথায়?

আজ চলে গেছে। তার ডিউটি শেষ। কাল দশটায় আসবে। বলে ডাক্তার চলে গেল।

কাল দশটায় আসবে! তাহলে সে আগামী কাল দশটার আগে ছাড়া পাচ্ছেনা! আর ডাক্তার কাল আসলেও যে ছাড়া পাব তারও নিশ্চয়তা নেই। যেন জেলে পুরে ফেলেছে। মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত খালাস পাওয়া যাবেনা। রোগ না থাকলেও ভর্তি হতে হবে। একবার ভর্তি হয়ে গেলে ছাড়া পাওয়া মুস্কিল। আর বাংলাদেশে তার উল্টো। রোগ থাকলেও ভর্তি হওয়া যায়না। এরই নাম আমেরিকা। তা না হলে কি মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আমেরিকায় আসে চিকিৎসা করাতে! এখন ঝিম মেরে পড়ে থাকা ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই।

রাত একটার সময় আর একজন ডাক্তার এল। মহিলা ডাক্তার। চে□ া নাকমুখ। আনিস প্রথম মনে করেছিল নার্স। পরে বুঝল ডাক্তার। তাকে অনেক কাকুতি মিনতি করে বুঝাতে সক্ষম হল যে তার তেমন কোন রোগ নেই। তার চাচা তার পথ চেয়ে সারা রাত বসে থাকবে। একটা ফোনও করতে পারেনি। তাকে যেন সাহায্য করে।

ডাক্তার চার্টটা হাতে নিয়ে বলল, তুমি প্রথম কাউন্টারে তোমার কি অসুবিধার কথা বলেছিলে?

বলেছিলাম প্রস্রাবটা পরীক্ষা করাতে চাই।

তুমি কি বলেছিলে তোমার প্রস্রাব লাল হয়?

না, না আমি সে লালের কথা বলিনি।

কি লালের কথা বলেছ?

তখন আনিস বূঝতে পারল তাকে নিয়ে এতসব কান্ড কেন হচ্ছে। আমাদের দেশে অসুখ নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলেই জিজ্ঞেস করে, প্রস্রাব কি লাল হয়? সেই একবার যখন আনিসের অসুখ হল, সাতদিন জ্বরে ভোগার পর ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, "প্রস্রাবের রং কেমন হয়?" আনিস জবাব দিয়েছিল, লাল হয়। তারপর জিহ্বা, চোখ, গলা আর পেট টিপে ঔষধ দিয়ে দিল। কয়েকদিনের মধ্যেই আনিস ভাল হয়ে গেল। লাল বললে ডাক্তার বুঝে নেয় সাদা নয়, বাদামী বা খয়েরি। কিন্তু এদেশে রেডকে লালই বুঝে এবং সেভাবেই চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। ডাক্তারকে বলল, আমি বুঝাতে চেয়েছিলাম ব্রাউন। নট ওয়াটার কালার, মানে একটু ব্রাউন টাচ।

তাহলে তোমার প্রস্রাব লাল নয়?

না, না লাল নয়।

ওখানেই তো তুমি সব ঝামেলা করেছ, ডাক্তার ভুল বুঝেছে। এখানে লেখা হয়েছে লাল, তার মানে তোমার প্রসাবের সাথে রক্ত যায়। অতএব তোমাকে সব রকমের পরীক্ষা করতে হবে, তোমার সমস্ত দায়িত্ব তখন ডাক্তারের। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার এক্সপ্রেশনে ভুল বুঝাবুঝি হয়ে গেছে। যাক, আমি চেষ্টা করছি তোমাকে রিলিজ করে দিতে। তবে তোমার কিছু কাগজে সই করতে হবে। বলতে হবে যে, যে কোন সময় তোমাকে ডাকলে তুমি হাসপাতালে এসে হাজিরা দেবে।

যেন দাগী আসামী। জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছে মুচলেকা দিয়ে।

আনিস বলল, আমি রাজি আছি যে কোন রকমের কাগজে সই করতে। দয়া করে আমার যাবার ব্যবস্থা করে দাও।

কতক্ষন পর ডাক্তার কিছু কাগজ নিয়ে এল। সই নিয়ে তাকে তার কাপড় ফেরত দিয়ে বলল, উইস ইউ গুড লাক।

ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিয়ে তার নিজের কাপড় পরে ছুটে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল আনিস। যেন দড়ি ছেড়া গরু। অথবা জেল থেকে পালিয়ে আসা কয়েদি। একটা ট্যাক্সিকে থামিয়ে লাফ দিয়ে উঠে বলল, নস্ট্রেন্ড এভিনিউ চল।

রাত দুটোয় এসে পৌঁছল ঘরে। আলম আর করিম বসে আছে। করিমের হাতে টেলিফোন। আনিসকে দেখেই তারা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল, নাকি আনিস হাফ ছেড়ে বাঁচল বুঝা গেলনা। করিম বলল, সন্ধ্যা থেকে হসপিটালে টেলিফোন করেই যাচ্ছি। শুধু বিজি। লাইন পাচ্ছিনা। এদিকে ঘুমাতেও পারছিনা। কি হয়েছিল বলতো! কোন বিপদ হয়নি তো?

না, কোন বিপদ হয়নি, একটা কথা ঠিকভাবে বলতে না পারায় এই দুর্গতি গেল। পরে বলব সব। আগে খেতে দিন। হসপিটালে রোগীর খাবার দিয়েছিল। খেতে পারিনি। এখন গন্ধওয়ালা মুরগীও খেতে পারব। কি আছে দিন। ক্ষিধে পেলে বাঘেও ঘাস খায়!

এম. বাহাউদ্দিনের উপন্যাস 'স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক' ধারাবাহিক ভাবে আমরা প্রকাশ করছি প্রতি রবিবার।
১০ টি পর্বে প্রকাশিতব্য এই উপন্যাসটির প্রথম পর্ব আজ রবিবার, মার্চ ০৬, ২০০৫ এ প্রকাশিত হলো।
আপনার মতামত লেখককে জানান এই ঠিকানায়ঃ probashi_writer@yahoo.ca
—সম্পাদক